ক্যাম্প
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

পূর্বকথা

নয়-দশ বছরের একটা কিশোর খালের পাড় দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ক্ষেতে উবু হয়ে নিড়ানি দিচ্ছিল মাহতাব মিয়া, সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই কাচু, দৌড়াস কেন? কী হইছে?'

'মেরে ফেলছে, মাহতাব চাচা।' চোখের পানি এবং নাকের পানিতে তার মুখটা মাখামাখি হয়ে আছে, সে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নাকটা মুছে বলল, 'ফজল ভাইকে মেরে ফেলেছে।'

মাহতাব মিয়ার মুখ দেখে মনে হলো সে কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি। কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, 'মেরে ফেলেছে?'

'জি চাচা। খালের মুখে দাঁড় করে গুলি করেছে।'

মাহতাব মিয়া আবার বলল, 'মেরেই ফেলল?'

ছেলেটা উত্তর না দিয়ে আবার দৌড়াতে শুরু করল। এতক্ষণ সে নিঃশব্দে কাঁদছিল, এখন সে ফোঁপাতে শুরু করেছে।

নয়-দশ বছরের ছেলেটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে খালের পাড় দিয়ে গ্রামের দিকে একটি মৃত্যুসংবাদ নিয়ে ছুটে যেতে লাগল।

জালু পাগলার কথা

কাজটা আমি ঠিক করি নাই, একেবারেই ঠিক করি নাই। আমি পাগল মানুষ, আমার কাজকর্মে একটু পাগলামি থাকলে ঠিক আছে। গ্রামের দশজন মানুষ পাগল বলে একটু মায়া-মহব্বত করে, তাই ইচ্ছা না থাকলেও মাঝে-মধ্যে একটু পাগলামি করতে হয়। মির্জা বাড়ির ডাকাতি কেইসে একবার সদর থেকে দারোগা সাহেব এলেন, খাওয়া-দাওয়ার আলিশান ব্যবস্থা। আমি গেলাম খোঁজ নিতে। দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'এইটা কে?' মির্জা সাহেব বললেন, 'আমাদের গ্রামের জালু পাগলা।' দারোগা সাহেব বললেন, 'দেখে তো পাগল মনে হয় না, দেখে তো ভালো মানুষই মনে হয়। পাগল একটা দেখেছিলাম কৃষ্ণপুর গ্রামে, চেইন দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়।' গ্রামের একটা ইজ্জত আছে। আমি তাই একটু পরে লুঙ্গিটা খুলে মাথায় বেন্ধে চলে এলাম। দারোগা সাহেব বললেন, 'পাগল হারামজাদারে বেন্ধে আন। পিটিয়ে আজকে তার পাগলামি ছোটাব।' মির্জা সাহেব বললেন, 'ছেড়ে দেন দারোগা সাহেব, পাগল মানুষ।' দারোগা সাহেব তখন ছেড়ে দিলেন, ছেড়ে না দিলে খবর ছিল। কিন্তু গ্রামের ইজ্জত তো রক্ষা হলো। দারোগা সাহেব এখন অন্য গ্রামে গিয়ে বলবেন, পাগল একটা দেখেছিলাম কুসুমখালি গ্রামে। নাম জালু পাগল, মাথায় লুঙ্গি বেন্ধে ঘুরে বেড়ায়।

তাই বলছিলাম পাগলামি করলে ঠিক আছে, কিন্তু বোকামি করলে ঠিক নাই। আমার নাম তো জালু বেকুব না, আমার নাম হচ্ছে জালু পাগলা। আমার তো বেকুবের মতো কাজ করা ঠিক না। কিন্তু আজকে একটা বেকুবের মতো কাজ করে ফেললাম। মস্ত বড় বেকুবের কাজ।

দোষ অবশ্যি আমার না। দোষ আফজল ভাইয়ের। বাজারে আফজল ভাইয়ের সাথে দেখা, আফজল ভাই বলল, 'হেই জালু পাগলা, তোর বাপেরা আসছে।' আমি বললাম, 'আফজল ভাই, আমি পাগল-ছাগল মানুষ, আমারে

নিয়ে হাসি-তামাশা করতে চান করেন, কিন্তু আমার বাপারে নিয়ে মশকরা করবেন না। আমার বাপ সম্মানী মানুষ।' আফজল ভাই শুনে বলল, 'আরে পাগলা তোর মিলিটারি বাপদের কথা বলি! পাঞ্জাবি মিলিটারি।' আমি বললাম, 'আফজল ভাই, মিলিটারির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। এরা জানোয়ারের অধম। এরা আমার বাপ না।' আফজল ভাই বলল, 'কেন, তুই না আয়ুব খানের ভক্ত। এই মিলিটারি যতগুলো আসছে তাদের সবার চেহারা আয়ুব খানের মতো।'

এ কথাটা শুনে অবশ্যি আমি একটু দুর্বল হয়ে পড়লাম। আয়ুব খান হচ্ছে আয়ুব খান, তার সঙ্গে তো আর অন্য দশজন মানুষের তুলনা নাই। কী চেহারা ছিল আয়ুব খানের, একেবারে বাঘের বাচ্চার মতো। যখন মার্শাল ল ছিল তখন সারা দেশ ঠাণ্ডা। আমাদের গ্রামের এত বড় মাস্তান হারুন মেম্বর, একদিন দেখি আয়ুব খানের মিলিটারি তারে বাজারে কান ধরে ওঠবস করাচ্ছে। কী দৃশ্য! কাজেই পাঞ্জাবি মিলিটারির চেহারা যদি আয়ুব খানের মতো হয় তাহলে তো গিয়ে একটু দেখে আসা দরকার। চেহারার তো একটা দাম আছে।

আমি তাই সকালে রওনা দিলাম। পাঞ্জাবি মিলিটারি ক্যাম্প করছে সদর স্কুলে। আমি কাছে যাই না, দূর থেকে উঁকিঝুঁকি দিই। কিছুই তো আর বলা যায় না। আয়ুব খানের মার্শাল ল'র সময় তো আর গুল্লি করে নাই, খালি লাঠির বাড়ি আর কানে ধরে ওঠবস। এইখানে অন্য ব্যাপার, এইখানে কথায় কথায় গুল্লি। কোথায় আয়ুব খান আর কোথায় টিক্কা খান।

স্কুলঘরের সামনে দেখি মানুষের ভিড়। যখন দেখি এত মানুষের ভিড় তখন ভাবলাম ভয় নাই। আরেকটু কাছে যাই। আরেকটু কাছে যেতেই বিপদ। বিরিশের মতো চেহারা একটা পাঞ্জাবি বলে, 'কৌন হায়। পাকড়াও।'

আমার কাপড় নষ্ট হওয়ার অবস্থা, কিন্তু পাগল মানুষ, ভয় পেলে তো হবে না। ভাবলাম, লুঙ্গিটা খুলে মাথায় বেন্ধে ফেলি। আবার মনে হলো আগে অবস্থা দেখি তারপর ব্যবস্থা। আমারে নিয়ে লাইন করাল। লম্বা লাইন, সেইখানে মজিবর মাস্টর আছে, কালু মিয়া আছে, কাজেম আলী আছে। আমার সঙ্গে রহিমুদ্দি। আমি বললাম, 'রহিমুদ্দি ভাই, ব্যাপারটা কী?' রহিমুদ্দি বলল, 'চোপ থাক হারামজাদা। কলমা পড়।' আমি বললাম, 'অজু নাই, এর মধ্যে কলমা পড়া কি দুরুস্ত আছে?' রহিমুদ্দি বলল, 'চোপ থাক হারামজাদা।'

প্রথমে ভাবছিলাম গুল্লি করবে। একটু পরে দেখি গুল্লি থেকেও খারাপ

অবস্থা। অর্ধেক মানুষরে দিল গুল্লির বাক্স টানতে আর বাকি অর্ধেকেরে দিল গাছ কাটতে। আমার কপাল ভালো, আমারে দিছে গাছ কাটতে। গুল্লির বাক্সের কী সোজা ওজন?

শালাদের কোনো মানসম্মান জ্ঞান নাই। মজিবর মাস্টর এত বড় সম্মানী মানুষ, তার মাথায় দিল একটা গুল্লির বাক্স, আর দশ গ্রামের বড় চোর ফালু মিয়ার মাথায় দিল একটা গুল্লির বাক্স। একবার ভাবলাম মেজর সাহেবের কাছে নালিশ দেই, কিন্তু শালাদের বিরিশের মতো চেহারা, কাছে যেতেই ভয় করে। আফজল কথা ঠিক বলে নাই, শালাদের চেহারা আয়ুব খানের নখের যোগ্যি নয়। আয়ুব খানের গায়ের রঙ ছিল পাকনা টমেটোর মতো, মুখটা ছিল বাঘের মতো। এই শালাদের গায়ের রঙ বাদাইম্যা। মুখ শিয়ালের মতো। আয়ুব খানের চেহারা দেখলে বুকের ভেতরে একটা শান্তি শান্তি ভাব আসে, আর এদের দেখলে ভয়ে পেটের ভেতরে পাক মারে।

আমারে একটা কুড়াল দিয়া স্কুলের বড় আমগাছটা দেখায়া বলে, 'কাটদো।' বলে কী হারামজাদারা? এত বড় গাছটা কাটব কেন খামাখা। আমি বললাম, 'মেজর সাহেব, গাছ নেহি কাটা। গাছ পাকনা পাকনা আম হায়।'

হারামজাদা কোনো কথা না বলে আমার পেছনে মারল একটা লাথি। সময়মতো লাফ দিয়ে সরে গেছিলাম দেখে রক্ষা। তা না হইলে বুটের লাথি লাগলে মাজা ভেঙে যেত। রহিমদ্দি এসে আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল, 'হারামজাদা, রঙ-তামাশা করিস না। গাছ কাটতে বলছে গাছ কাট।'

আমি বললাম, 'কী বলেন রহিমদ্দি ভাই? এত বড় একটা গাছ, দেখেন কত আম ধরেছে।'

রহিমদ্দি বলল, 'চোপ হারামজাদা। নিজে মরলে মর আমারে মারিস না। আমার সঙ্গে কথা বলবি না। ভাগ।'

আমি দেখলাম রহিমদ্দি ভাই একটা বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ কাটতে শুরু করল। আমি তখন গেলাম কাজেম আলীর কাছে। গিয়ে বললাম, 'কাজেম আলী ভাই।'

কাজেম আলী বড় নারকেল গাছটা কাটতেছে, আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'ভাগ জালু পাগলা, ভাগ।'

আমি বললাম, 'এত বড় একটা গাছ কেটে ফেলা কি উচিত হবে? গাছেরও তো জান আছে। বদদোয়া দেবে না?'

কাজেম আলী দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'খুন করে ফেলব, হারামজাদা। ভাগ আমার কাছ থেকে।'

আমি তখন তাকিয়ে দেখি বিরিশের মতো পাঞ্জাবি মিলিটারি আমার দিকে আসে, তখন আর কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি আমগাছ কাটা শুরু করলাম। একটা করে কোপ দেই আর চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়ে। শেখ সাহেবের ওপরে রাগ সেইটা জানি কিন্তু গাছের ওপরে রাগ কেন? গাছ কী দোষ করেছে?

তখন হঠাৎ একটা হৈচৈয়ের শব্দ শুনলাম। তাকিয়ে দেখি স্কুলের গেটে মানুষের ভিড়। এত দূর থেকে কিছু বোঝা যায় না, ভাবলাম কাছে গিয়া দেখি। কুড়ালটা গাছের নিচে রেখে রওনা দিলাম, রহিমদ্দি দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'কই যাস, জালু পাগলা?'

আমি বললাম, 'স্কুলের গেটে গোলমাল, রহিমদ্দি ভাই। কী বিত্তান্ত একটু দেখে আসি।'

রহিমদ্দি বলল, 'তোরে গাছ কাটতে বলছে গাছ কাট। বেশি সাহস দেখাবি না।'

আমি বললাম, 'এক নজর দেখে আসি রহিমদ্দি ভাই।'

'পাঞ্জাবি মিলিটারি কিন্তু খুন করে ফেলবে তোরে।'

'খালি একবার যাব আর আসব।'

আমি তখন কুড়ালটা আমগাছের নিচে রেখে স্কুলের গেটের দিকে হাঁটা দিলাম। কাজটা মনে হয় ঠিক হয় নাই, কিন্তু পাগল-ছাগল মানুষ, মাথায় কিছু একটা ঢুকলে সেটা আর বার করতে পারি না। বন্দুক হাতে বিরিশের মতো পাঞ্জাবি মিলিটারিটাও স্কুলের গেটের দিকে যাচ্ছে, আমারে না আবার দেখে ফেলে! বিপদ হয়ে যাবে তাহলে।

স্কুলের গেটের কাছে গিয়া দেখি আমাগো গ্রামের ফজল, হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। আমি বললাম, 'আরে ফজল, তুমি?'

ফজল আমার দিকে তাকাল, কিন্তু মনে হয় চিনতে পারল না। তারে খালি বাঙ্গে নাই, মনে হয় মারপিট করছে, চোখের কাছে মারের দাগ, কপালটা কাটা। শার্টের পকেটটা ছেঁড়া। আমি বললাম, 'ফজল, আমারে চিন নাই? আমি জালাল।'

তখন শুনলাম কে জানি বলল, 'আরে! জালু পাগলা এই খানে কী করে? যা ব্যাটা ভাগ!'

আমি তাকাইয়া দেখি মোতি রাজাকার। তার কাঁধে বন্দুক। সঙ্গে আরো কয়েকজন, ইন্দুরের মতো চেহারা, আগে কখনো দেখি নাই। মনে হয় এই গ্রামের না। তাদের ঘাড়েও বন্দুক। আমি বললাম, 'মোতি ভাই, এইটা কী ব্যাপার? ফজল ভাইরে বেন্ধে রেখেছেন কেন? খুলে দেন।' আমি নিজেই গেলাম খুলে দিতে, তখন কে যেন আমারে পেছন থেকে একটা লাথি মারল। আমি একেবারে উল্টাপাল্টা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম আর সেইটা দেখে সবাই হি হি করে হাসতে লাগল।

আমি মাথা তুলে তাকালাম, দেখি বিরিশের মতো সেই পাঞ্জাবি মিলিটারি, দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'তোম ইধার কিউ? তোম গাছ নেহি কাটতি কিউ?'

আমি জিনিসটা তাকে বোঝানোর জন্য কিছু একটা বলার চেষ্টা করলাম, পাঞ্জাবিটা মনে হয় কিছু না শুনে তার বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মুখটাই ভেঙে দিত, কিন্তু মোতি রাজাকার আমারে বাঁচাল, বলল, 'ওস্তাদজি, ইয়ে পাগলা হায়।'

'পাগলা?'

'ইসকা দিমাগ খারাপ হায়।'

'দিমাগ খারাপ?'

আমার মাথা খারাপ শুনে বিরিশের মতো পাঞ্জাবি মিলিটারি মনে হয় খুব খুশি হলো। পা দিয়ে আদর করে একটা লাথি দিয়ে হা হা করে হাসা শুরু করল। আমি গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে শরীর থেকে ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে বললাম, 'ওস্তাদজি, ফজলকে খুলে দেন। ও বহুত আচ্ছা। এক চান্সে মেট্রিক। বহুত বহুত আচ্ছা। গুড ম্যান।'

মোতি রাজাকার আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'যা পাগলা, ভাগ এখান থেকে।'

মোতি রাজাকার আমার কথা শুনতে রাজি না হলেও পাঞ্জাবি মিলিটারির খুব উৎসাহ, সে তার কালা কালা দাঁত বের করে মোতি রাজাকারকে জিজ্ঞেস করল, 'কেয়া বলতা হায়? ইয়ে পাগলা কেয়া বলরা হি?'

মোতি রাজাকার বলল, 'কুস নেহি।'

পাঞ্জাবি মিলিটারি ফজলের বুকে ধাক্কা দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বলল, 'তুম ভি মুক্তি হায়? তুম ভি জয় বাংলা?'

আমারে বেকুব পেয়েছে! সকালে একটা বেকুবি করে এইখানে আটকা

পড়েছি, এখন আরেকটা বেকুবি করে গুল্লি খাব নাকি! আমি বুকে থাবা দিয়ে বললাম, 'নেহি। হাম জয় বাংলা নেহি। হাম পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

বিরিশের মতো পাঞ্জাবিটা আমার কথা শুনে হা হা করে হাসতে লাগল। তারপর সবাইরে নিয়ে স্কুলঘরের দিকে যেতে লাগল। এইখানে স্কুলঘরে মেজর সাহেব থাকে। মেজর সাহেবরে এক নজর দেখতে পারলে হতো, চেহারাটা কেমন কে জানে। মেজর সাহেবের চেহারা মনে হয় ভালোই হবে।

ফজল আর মোতি রাজাকারের সঙ্গে সঙ্গে আমি যাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মোতি রাজাকার আমারে ভাগিয়ে দিল। আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম বিরিশের মতো পাঞ্জাবিটা মোতি রাজাকার আর ফজলকে নিয়ে মেজর সাহেবের ঘরে ঢুকেছে। তার সঙ্গের ইন্দুরের মতো দেখতে রাজাকারগুলারে ভেতরে ঢুকতে দেয় নাই। সেই গুলাও মুখ কালা করে বাইরে দাঁড়া হয়ে আছে। ভেতরে কী হচ্ছে, দেখার জন্য আমি উঁকিঝুঁকি দিলাম, কিন্তু দরজায় পর্দা টানানো তাই ভেতরে কী হচ্ছে দেখতে পারলাম না। বিরিশের মতো পাঞ্জাবিটা তখন বের হয়ে আমাদের সবাইরে একটা ধামকি দিয়ে বলল, 'যাও, যাও শালা লোগ ভাগো হিয়াসে।'

আমি তখন হেঁটে হেঁটে আমার জায়গায় ফিরে এলাম। রহিমদ্দি তখন কৃষ্ণচূড়া গাছটা অনেকখানি কেটে ফেলেছে। আমাকে দেখে গাছ কাটা বন্ধ করে বলল, 'কী হইছে রে জালু পাগলা?'

'ফজল ভাইরে ধরে আনছে। হাত পিছনে বান্ধা। মনে হয় কিছু মারপিট করেছে।'

কাছাকাছি যারা ছিল তারাও শোনার জন্য চলে আসে। আমি মুখ গম্ভীর করে বললাম, 'অবস্থা কেরাসিন মনে লয়।'

'কে ধরে আনছে? পাঞ্জাবি?'

'না। মোতি রাজাকার।'

কাজেম আলী ফিসফিস করে বলল, 'ফজল না বর্ডার পার হইছিল!'

রহিমদ্দি মাথা নাড়ল।

'তা হলে আবার আসল কেন?'

'মরণে টানছে।'

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, 'না না। ভয়ের কিছু নাই।'

রহিমদ্দি অবাক হয়ে বলল, 'ভয়ের কিছু নাই?'

'না রহিমদ্দি ভাই। মেজর সাহেব মনে হয় লোক ভালো। ফজলরে মনে হয় ছেড়ে দেবে। কিছু পিটা দিতে পারে, পিটা দিয়ে মনে হয় ছেড়ে দেবে।'

'তুই কেমন করে জানিস?'

'এটা না জানার কী আছে? ফজল ভাই কোনো দোষ করেছে? কোনো মানুষ দোষ না করলে তারে কেউ মারে?'

রহিমদ্দি মাটিতে থুতু ফেলে বলল, 'ব্যাটা বেকুব কোথাকার।' তারপর তার গাছ কাটতে শুরু করল। আমি আমগাছের নিচে বসে রইলাম। রহিমদ্দি গাছ কাটা বন্ধ করে বলল, 'ওই শালা জালু পাগলা।'

'আমারে গালিগালাজ করবেন না রহিমদ্দি ভাই। মন-মেজাজ ভালো নাই।'

'লাটসাহেবের মতো বসে আছিস, তোর জানের মায়া নাই?'

'জানের মায়া থাকবে না কেন? এটা কী রকম কথা বলেন?'

'তা হলে কুড়ালটা হাতে নিয়ে গাছ কাটা শুরু কর।'

'রহিমদ্দি ভাই, একটা জিনিস আগে বলেন।'

'কী জিনিস?'

'পাঞ্জাবিরা শেখ সাহেবরে দেখতে পারে না। আওয়ামী লীগরে দেখতে পারে না। জয় বাংলারেও দেখতে পারে না। এর কারণটা কী?'

রহিমদ্দি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হে হে করে হাসতে লাগল। বলল, 'তুই বুঝবি না জালু পাগলা। যদি তুই বুঝতি, তাহলে তোরে কেউ জালু পাগলা ডাকত না।'

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, 'সেইটা ঠিক বলেছেন। কোনো কিছু নিয়ে বেশি চিন্তা করলেই মাথাটা আউলা-ঝাউলা হয়ে যায়।'

রহিমদ্দি কুড়াল দিয়ে গাছটা প্রায় কেটে শেষ করে এনেছে, এখন একটা ধাক্কা দিলেই গাছটা হুড়মুড় করে পড়বে। বেচারা গাছটার নিশ্চয়ই কত কষ্ট হচ্ছে। আমি বললাম, 'রহিমদ্দি ভাই।'

'কী হলো?'

'পাঞ্জাবিরা শেখ সাহেবরে দেখতে পারে না সেইটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু গাছরে কেন দেখতে পারে না? গাছ তো নৌকারে ভোট দেয় নাই। দিছে?'

'আরে গাধা, গাছ কাটে যেন কোনো মুক্তিবাহিনী কাছে আসতে না পারে। গাছপালা না থাকলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পারবে।'

ব্যাপারটা আমার তখনো পরিষ্কার হলো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মুক্তিবাহিনীরে পাঞ্জাবিরা খুব ভয় পায়?'

রহিমদ্দি এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, 'জালু পাগলা, পাঞ্জাবিদের ক্যাম্পে বসে এইসব কথা বলিস না। জবাই করে ফেলবে তোরে।'

আমি গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'কিন্তু মুক্তিবাহিনীরা থাকে কই, রহিমদ্দি ভাই? আমি তো দেখি না।'

রহিমদ্দি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'দেখিস না?'

'না।'

রহিমদ্দি ভাই গলা নামিয়ে বলল, 'ফজল হলো ধর একজন মুক্তিবাহিনী।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ফজল?'

'হ্যাঁ'।

'আমাগো কুসমখালির ফজল? যারে ধরে আনছে?'

'হ্যাঁ।'

'সে তো একটা বাচ্চা পোলা।'

'তাতে কী হয়েছে?'

রহিমদ্দি ভাই মনে হয় বিষয়টা ভালো জানে না। ফজলের মতো ছোট একটা পোলা আবার মুক্তিবাহিনী হয় কেমন করে? আমি পাগল-ছাগল মানুষ, সেই জন্য লোকজন আমার সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরাও করে। কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা ভালো বুঝতেও পারি না। না বুঝলে নাই। আমি আমগাছটাতে হেলান দিয়ে বসে রইলাম। মাথাটা কেমন যেন আউলা-ঝাউলা হওয়া শুরু করল।

রহিমদ্দি আমাকে ডাকল, 'এই জালু, জালু পাগলা '

'কী হইছে, রহিমদ্দি ভাই?'

'এই রকম লাটসাহেবের মতো বসে থাকিস না। গাছ কাট।'

'আমার গাছ কাটতে হবে না।'

'কেন?'

'পাঞ্জাবি মিলিটারি বলছে।'

'কী বলছে?'

'বলছে আমার দিমাগ খারাপ। দিমাগ খারাপ মানে হচ্ছে মাথা পাগলা। মাথা পাগলা মানুষের কিছু করা ঠিক না।'

'হারামজাদা!'

'গালি দেন কেন, রহিমদ্দি ভাই?'

'জাতে পাগল তালে ঠিক।'

'এই কথাটার কী মানে, রহিমদ্দি ভাই?'

'চোপ কর হারামজাদা। কথা বলিস না।'

রহিমদ্দির হঠাৎ এত রাগ হয়ে গেল কেন আমি বুঝতে পারলাম না। আমি বললাম, 'রহিমদ্দি ভাই, আপনার গাছটা কেটে আমারটাও কাটবেন। তা না হলে মেজর সাহেব কিন্তু রাগ হতে পারে।'

রহিমদ্দি চোখ লাল করে আমার দিকে তাকাল। আমার কোনো কাজ নাই বলে ঘুরে ঘুরে সবার কাজ দেখতে লাগলাম। ট্রাক থেকে গুলির বাক্স নামিয়ে আনছে। একটার পর একটা গাছ কেটে নামিয়ে ফেলছে, জায়গাটা দেখতে এখন কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মাথায় যখন আমার চুল বেশি হয়, উকুন কুট কুট করে কামড়ায়, তখন ন্যাড়া করে ফেললে এই রকম ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

আমি হেঁটে হেঁটে খালের পাড়ে গিয়ে বসলাম। পেটে খিদা পাক দিতে শুরু করছে। খিদা আমি একদম সহ্য করতে পারি না। বাজারের দিকে যাব কি না বুঝতে পারলাম না, একা একা গেলে আবার কী বিপদ হয় কে জানে। আমি খালের পাড়ে চুপচাপ বসে রইলাম, চারদিক থেকে কুড়ালের খটখট শব্দ হচ্ছে। এই এলাকার দশ গ্রাম থেকে ধরে আনা মানুষ মিলে এক সাথে গাছ কাটছে। একদিনে গাছ কেটে সাফ করে ফেলবে মনে হয়। স্কুলের সব গাছ কেটে যদি গ্রামের সব গাছ কাটা শুরু করে তখন কী হবে? গ্রামের সব গাছ কেটে যদি দেশের সব গাছ কেটে ফেলে তখন কী হবে? আমি আর চিন্তা করতে পারলাম না, মাথাটা আবার আউলে যেতে লাগল।

কতক্ষণ খালের পাড়ে বসে ছিলাম কে জানে। হঠাৎ একটা আজব জিনিস হলো, চারদিকে যে খটখট শব্দ সেই শব্দটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কারণটা কী? গাছ কাটা বন্ধ হয়ে গেল কেন? আমি কারণটা দেখার জন্য উঠে দাঁড়ালাম আর তখন একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলাম মেজর সাহেবের সামনে।

আমারে কেউ বলে দেয়নি কিন্তু দেখেই আমি বুঝতে পারলাম এইটা নিশ্চয়ই মেজর সাহেব। কী খান্দানি চেহারা, গায়ের জামাকাপড় কী পরিষ্কার। আমারে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'হু আর ইউ?'

আমি ইংরেজি জানি না কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে মেজর সাহেব কী

জিজ্ঞেস করছেন বুঝতে আমার একটুও অসুবিধা হলো না। আমি প্রথমেই একটা সালাম দিয়ে বললাম, 'হাম জয় বাংলা নেহি। হাম পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

মেজর সাহেব কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, মনে হলো রেগে উঠবেন, কিন্তু খুব খান্দানি মানুষ শেষ পর্যন্ত রাগলেন না, তার মুখে একটু হাসি দেখা গেল। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল, তারা উর্দুতে কিছু বলল, আমি তার মধ্যে 'দিমাগ খারাপ' কথাটা শুনতে পেলাম। আমি তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললাম, 'হাম দিমাগ খারাপ। হাম জালু পাগলা। গুড ম্যান।'

একটা ইংরেজি শব্দ বলে ফেলতে পেরেছি জায়গা মতোন সেটা কম কথা না! মনে হয় ইংরেজি শব্দটাতেই কাজ হলো, মেজর সাহেব জোরে জোরে হেসে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম তার সঙ্গে বেশ অনেকগুলো মিলিটারি, আর যা ভেবেছিলাম তাই! পেছনে পেছনে ফজল আসছে। ফজলের হাত খোলা-মেজর সাহেব ফজলকে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবেন! সেই জন্যই নিয়ে আসছেন। খান্দানি মানুষ খামোখা এ রকম একটা শিক্ষিত ছেলেকে তো ধরে-বেঁধে রাখবেন না। পেছনে পেছনে মোতি রাজাকারও আছে—মোতি রাজাকারের মুখটা কালো, মনটা খারাপ। শালার বেটা শালা মনে হয় ফজলকে ছেড়ে দেবে বলে মনটা খারাপ।

আমি পিছে পিছে গেলাম। মেজর সাহেব খালের পাড়ে দাঁড়ালেন, সেখানে একটা সিগারেট ধরালেন; তারপর ফজলকে কিছু বললেন। দূর থেকে বোঝা গেল না, মনে হলো ফজল কিছু উত্তর দিল। মেজর সাহেব হাসলেন; তারপর হাসতে হাসতে ফিরে আসতে লাগলেন। আমি যা ভেবেছিলাম তাই, সবাই চলে আসছে, শুধু ফজল একা দাঁড়িয়ে আছে। সবাই চলে গেলে আমি যাব ফজলের কাছে। গিয়ে বলব বাড়িতে গিয়েই একটা সদকা দিতে। জানের সদকা জান, মালের সদকা মাল। একটা মুরগি সদকা দিতে হবে।

আস্তে আস্তে সবাই চলে গেল, শুধু দুজন পাঞ্জাবি মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে। এই দুজন যায় না কেন? আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম, আরে কী আশ্চর্য, মোতি রাজাকারও দেখি দাঁড়িয়ে আছে! বন্দুকটার ওপরে ভর দিয়ে ফজলের দিকে তাকিয়ে আছে। তার পেছনে ইন্দুরের মতো চেহারার দুজন রাজাকার। সেই দুইটাও তাকিয়ে আছে ফজলের দিকে। ব্যাপারটা কী? আমি

চারদিকে তাকালাম, সবাই কাজ বন্ধ করে তাকিয়ে আছে ফজলের দিকে। পাঞ্জাবি মিলিটারিটা কিছু একটা বলল ফজলকে। ফজল মনে হলো বুঝতে পারল না, তখন আরেকবার বলল তারে। একটা মিলিটারি গেল তার কাছে। ফজল তখন খালের পানির দিকে হাঁটতে লাগল। পানির কাছে গিয়ে দাঁড়াল ফজল। তার খালি পা, গোড়ালি পর্যন্ত পানিতে ডুবে আছে। সে তাকিয়ে আছে মিলিটারিটার দিকে, দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে, কী আশ্চর্য ব্যাপার! আমি ফজলের দিকে তাকালাম, ছেলেটার মুখটা একেবারে মরা মানুষের মতো শাদা। ব্যাপারটা কী? আমি ভালো করে তাকালাম, থর থর করে কাঁপছে ছেলেটা? কাঁপছে কেন এই ভাবে?

ইংরেজিতে কে যেন কী বলল চিৎকার করে। হাতের বন্দুকটা ওপরে তুলেছে মিলিটারি, কী সর্বনাশ! গুলি করবে নাকি? ইয়া আল্লাহ! ইয়া মাবুদ! ইয়া পরওয়ারদিগার। হায় খোদা...

আমার মাথাটা হঠাৎ আউলে ঝাউলে গেল।

মোতি রাজাকারের কথা

মাঝে মাঝে কিছু জিনিস হয়, যেটাকে প্রথমে মনে হয় খারাপ, তারপর দেখা যায় আসলে সেটা ভালো। খালি ভালো না অসম্ভব ভালো। তার এক নম্বর উদাহরণ হচ্ছে ছয় দফা! শেখ মুজিব ছয় দফার লোভ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সব মানুষরে তার দলে টেনে নিয়েছে, কেউ শুনলে বিশ্বাস করবে না ইলেকশনে সব সিট আওয়ামী লীগের, তাদের হাবভাব দেখে মনে হয় দেশ বুঝি আসলেই জয়বাংলা হয়ে গেছে। এত দিন থেকে জামাতে ইসলামির রাজনীতি করি, কত কষ্ট করে ইসলামি ছাত্রসংঘের কলেজ কমিটির সেক্রেটারি হয়েছি—মনে হলো সব বুঝি গেল! পাকিস্তানের কথা বলি দেখে দেশের মানুষের সামনে আমরাই যেন শত্রু। তারপরে আসছে পঁচিশে মার্চ—পাকিস্তানি মিলিটারি দেখাল মাইর কারে বলে। এক রাতে সারা দেশ ঠাণ্ডা!

এখন দেশের অবস্থা একেবারে অন্য রকম। যত মালাউন সব ভাগছে ইন্ডিয়ায়, শালাদের বাড়িঘর ব্যবসাপাতি আমাদের হাতে। যত আওয়ামী লীগ আর কমিউনিস্ট তারাও ভাগছে, যেগুলা ভাগে নাই সেইগুলারে ধরে ধরে একটা একটা করে জবাই করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ আর কমিউনিস্টের বাবার সাধ্য নাই এই দেশে কোনো দিন মাজা সোজা করে দাঁড়ায়। শেখ মুজিব জেলে—ইয়াহিয়া খান একদিন ফাঁসিতে লটকে দেবে, ব্যস খেল খতম। তখন এই দেশে রাজনীতি করবে কে? বাকি আছে জামাতে ইসলামি আর মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের বুড়া পলিটিশিয়ানরা রাজনীতির কিছু বুঝে? কিছু বুঝে না, নিজেদের মধ্যে খালি ঝগড়া-বিবাদ করে। বাকি থাকল শুধু জামাতে ইসলামি। জামাতে ইসলামিরে এখন ঠেকাবে কে? রাজাকার বাহিনী তৈরি হয়েছে, লিডারশিপ জামাতে ইসলামির; বদরবাহিনী তৈরি হয়েছে, সেটার লিডারশিপও জামাতে ইসলামির। আমাদের লিডার গোলাম আজম সকাল-বিকাল টিক্কা খানের সঙ্গে মিটিং করেন। এই দেশে ক্ষমতার

এক নম্বর জায়গা মিলিটারির, দুই নম্বর জায়গা আমাদের। এই জিনিসটা কি কেউ ছয় মাস আগেও চিন্তা করেছিল? একটা জিনিস, যেটাকে ভাবছিলাম বিপদ, সেইটা হয়ে গেল সুযোগ। এইটাকেই মনে হয় বলে শাপে বর। তবে শাপে বর কথাটার মধ্যে একটা হিন্দু হিন্দু গন্ধ আছে। এইটার একটা মুসলমান কথা থাকলে ভালো হতো, যেমন ধরা যাক গজবে মেহেরবানি! খারাপ না কথাটা—প্রথম প্রথম শুনতে একটু অন্য রকম লাগে, তারপর অভ্যাস হয়ে যায়। যে রকম বলা যায় কালীনগর রেলস্টেশনের কথা, মিলিটারি আসার পর নাম দেওয়া হলো ফাতেমানগর। প্রথম কয়দিন কেউ চিনে না, কিন্তু এক সপ্তাহ পার না হতেই সবাই চিনে ফেলল। সেই রকম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নামও বদল করে হবে মৌলভীবাড়িয়া, এখনো সেটা করা হয় নাই। তবে ব্রাহ্মণ কথাটা যেন উচ্চারণ করতে না হয় সেই জন্য বলা হয় বি-বাড়িয়া। বি-বাড়িয়া থেকে হবে এম-বাড়িয়া, এম বাড়িয়া থেকে মৌলভীবাড়িয়া। আরো একটা নাম পরিবর্তন করতে হবে, সেইটা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ থেকে হবে ইউসুফগঞ্জ! আগে যে সমস্ত জিনিস করা অসম্ভব কঠিন একটা ব্যাপার ছিল, এখন সেটা হয়ে গেছে ডাল-ভাত। শহীদ মিনার নিয়ে কী ঢংই না করত পোলাপান। এখন সেই শহীদ মিনারের কোনো চিহ্ন নাই। একেবারে গুঁড়া করে দেওয়া হয়েছে। এখন দেখি একুশে ফেব্রুয়ারি করো কী রকম? ফুল দিয়ে পূজাটা করো কোন শিবলিঙ্গরে? বেপর্দা মেয়েদের নিয়ে ঢলাঢলিটা করো কোন জঙ্গলে? সোজা জিনিসটা না বুঝলে বিপদ, আল্লাহ যদি পাকিস্তানের পক্ষে থাকে তাহলে বাংলাদেশটা হবে কেমন করে?

তবে সময়টা খুব জটিল। সেন্ট্রাল কমিটির লিডারদের সাথে কথা বললে সেটা বোঝা যায়। এই রকম একটা মিলিটারি থাকার পরও সবাই পুরা ব্যাপারটা সব সময় ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করে। মিলিটারি অর্ধেক কাজ করে রেখেছে, বাকি অর্ধেক করতে হবে আমাদের। দেশের বড় সমস্যা হচ্ছে এই দেশের আঁতেলরা। এই আঁতেল হারামজাদাদের একটা একটা করে টিপে টিপে শেষ করতে হবে। কাজ শুরু হয়ে গেছে, এই কাজ যেই দিন শেষ হবে সেই দিন থেকে আর কোনো চিন্তা নাই।

তবে আমার মনে হয় দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা ইন্ডিয়ান এজেন্টরা। তারা নাকি মুক্তিবাহিনী—আরে শালার মুক্তিবাহিনী, যদি দুই-চারটা ফুটটুস-ফাটটুস করে পাকিস্তান মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করা যেত তাহলে তো কাজই

হতো! যুদ্ধ করা এত সোজা? পনেরো দিন লেফট রাইট করে একটা থ্রি নট থ্রি রাইফেল নিয়ে এলেই যুদ্ধ হয়? শালারা ব্যাটাদের পরনে কাপড় নাই, লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বৃষ্টিতে ভিজে, পায়ে জুতা নাই, খালি পায়ে প্যাক-কাদার মধ্যে হাঁটে—তারা নাকি যুদ্ধ করবে! মুখের কথায় যুদ্ধ হয়? আমেরিকা আর চীন আমাদের দিকে, আর তুমি শালা যুদ্ধ করবে আমাদের সাথে? আমেরিকার নাম শুনছ? যেই দেশ ধমক দিলে অর্ধেক পৃথিবীর মানুষ কাপড়ে পেশাব করে ফেলে, সেই দেশ আমাদের সঙ্গে! তোমাদের কোনো চান্স নাই। তোমরা মরবে উকুনের মতো। ছারপোকার মতো।

তবে সেন্ট্রাল কমিটি বলেছে, নিজের এলাকায় যেতে—এসে রাজাকার বাহিনীর লিডারশিপটা নিতে। আমরা যদি লিডারশিপ না নিই তাহলে অশিক্ষিত চোর-ছেঁচড়রা ঢুকে যাবে। তখন হবে আরেক বিপদ। সেন্ট্রাল কমিটির কথা শুনে কুসুমখালী এসেছি, নিজের গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দরকার। এই রকম বিপদের সময় কে পাশে আছে আর কে পাশে নাই সেটা সবাই দেখতে চায়। সবাই দেখুক আমি আছি। দেশে এখন রাজনীতি নাই, এইটাই হচ্ছে লিডার হওয়ার সময়।

তবে কিছু সমস্যা আছে। শিক্ষিত ছেলেপিলের খুব অভাব। পোলাপান জয় বাংলার মধ্যে যে কী মজা পেয়েছে কে জানে। একেবারে দল বেঁধে ইন্ডিয়া গেছে, গিয়ে এখন বুঝতেছে মজা। খাওয়া নাই-দাওয়া নাই, থাকার জায়গা নাই, ঘুমের জায়গা নাই, পায়খানা-পিশাবের জায়গা নাই। সাহস করে যদি যুদ্ধ করতে আসে, তাহলে একেবারে পোকা-মাকড়ের মতো মরে। যুদ্ধ করে মরে সব শালা যাবে দোজখে! সেন্ট্রাল কমিটি থেকে বলেছে, ধৈর্য ধরতে। ধৈর্য ধরতে আর নজর রাখতে, যারা গেছে তাদের ধরতে হবে। যদি তাদের ধরা না যায়, তাদের ফ্যামিলিরে ধরতে হবে। পাকিস্তান মিলিটারি আসছে হাজার মাইল দূর থেকে, তারা এই দেশে কারে চিনে? কাউকে চেনে না। চিনি আমরা, দায়িত্বটা আমাদের। মিলিটারি নিয়ে একটা একটা বাড়ি যেতে হবে, বাড়িতে আগুন দিতে হবে, জোয়ান ছেলে দুই-চারটা মারতে হবে। তবে সবচেয়ে কাজ হয় মেয়েগুলোরে ধরে আনলে। তখন জন্মের মতো টাইট হয়ে যায়। গনিমতের মাল, কোনো গুনাহ নাই—এইটা হচ্ছে সবচেয়ে ভরসার কথা।

যেমন ধরা যাক আজ রাতের ব্যাপারটা। ইদরিস মিয়া খবর আনছে

মাস্টারবাড়ির ছোট ছেলে ফজল নাকি এই এলাকায়। মুক্তিবাহিনীর একটা দলের সঙ্গে কয়দিন থেকে ঘুরঘুর করছে—বাড়ির এত কাছে আসছে, একবার কি মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবে না? নিশ্চয়ই যাবে। আশপাশে কয়দিন ফুটটুস ফাটটুস করতে করতেই গুলি শেষ। এখন আবার গুলি আনতে যেতে হবে ইন্ডিয়ায়, আবার কবে আসবে তার কি ঠিক আছে? যাওয়ার আগে একবার নিশ্চয়ই বাড়িতে আসবে। সেই জন্য আমি তক্কে তক্কে আছি, লোকজন পাহারায় আছে। ইদরিস মিয়ারে বলেছি চোখ-কান খোলা রাখতে। ফজলের বাড়ির কাছে সুখেন্দুর বাড়ি, তার বাড়িটা দখলে নিয়েছে মজিবর চেয়ারম্যান, সেই বাড়িতে আছে কাশেম আর মুকাদ্দেস। আমার ডান হাত আর বাম হাত। বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ নাই, তবে আমার কথা শোনে। আমি বলেছি, একটা হিন্দুর বাড়ি না হলে হিন্দুর দোকানের দখল দিয়ে দেব, সেইটা বিশ্বাস করে আমার সঙ্গে আছে। এই হচ্ছে অশিক্ষিত মানুষের অসুবিধা, কোনো রাজনীতির জ্ঞান নাই—কাজকর্ম করে লোভের জন্য। তবে সেইটাও রাজনীতি, যার লোভ আছে তার সেই লোভরে ব্যবহার করে নিজের কাজ করাও রাজনীতি। সেইটা আরো বড় রাজনীতি।

ফজল যদি আসে, মাঝরাতের পরে আসবে—আর যাবে সূর্য ওঠার আগে। কাজেই আমাদের হাতে সময় চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা। এই চার-পাঁচ ঘণ্টা সজাগ থাকলেই এরে ধরা যাবে। এরে ধরা খুব জরুরি, এই এলাকায় নতুন যে মিলিটারির দল আসছে তার সঙ্গে আছে মেজর সামশেদ। একটা জ্যান্ত মুক্তিবাহিনী ধরে তার হাতে দিতে পারলে তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক হয়। সম্পর্ক করলে করতে হয় সবচেয়ে ওপরের মানুষের সঙ্গে। ছোটখাটো পাতি নেতা হয়ে লাভ নেই, নেতা হতে হলে হতে হবে সবচেয়ে বড় নেতা। এখন আমারে বেশি মানুষ চিনে না, একটা জ্যান্ত মুক্তিবাহিনী ধরতে পারলে দশ গ্রামের মানুষ আমারে চিনবে।

রাতে সকাল সকাল খেয়ে আমি বাংলাঘরে শুয়ে পড়লাম। নানা রকম চিন্তায় ঘুম আসতে চায় না। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়েছে, তা না হলে যা গরম পড়েছে সেটা আর বলার না। বিছানায় শুয়ে পাখা দিয়ে নিজেরে বাতাস করতে করতে এক সময় চোখে ঘুম চলে আসল।

আমার ঘুম ভাঙল মুকাদ্দেসের ডাকে, সঙ্গে সঙ্গে আমি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠলাম। চাপা গলায় বললাম, 'কে? মুকাদ্দেস?'

'জে, মোতি ভাই।'

'কী খবর?'

'খবর ভালো।'

আমি অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কত ভালো?'

'অনেক ভালো। ফজল বাড়িত আসছে।'

আমি আনন্দ চেপে রাখতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'সত্যি?'

'খোদার কসম।'

'কী করে এখন?'

'মায়ের সঙ্গে কথা বলে ভাইবোনের সঙ্গে কথা বলে।'

'কতক্ষণ থাকবে মনে হয়?

'সেটা তো জানি না মোতি ভাই। এত দিন পরে আসছে, কিছু সময় কি আর থাকবে না?'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে একটা প্যান্ট পরলাম। একটা শার্ট পরলাম। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো পরতে পরতে জিজ্ঞেস করলাম, 'খালি হাতে আসছে নাকি হাতে কোনো অস্ত্রপাতি আছে?'

'মনে হয় আছে। চাদর দিয়ে ঢাকা তাই বোঝা যায় না।'

'মাশআল্লাহ।' যদি শালারে অস্ত্রসহ ধরতে পারি, তাহলে তো কথাই নাই। আমি ঘর থেকে বের হতে হতে বললাম, 'চল তাড়াতাড়ি।'

'কোথায় যাবেন, মোতি ভাই?'

'আগে থানায়। দুই-চারটা রাজাকার নিয়া আসি। খালি হাতে যাওয়া ঠিক না, কখন কী হয়।'

মুকাদ্দেস মাথা নাড়ল, বলল, 'সেইটা ঠিকই বলেছেন।'

ঘণ্টাখানেক পরে আমরা ফজলের বাড়িটা চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেললাম। যখন দেখলাম পালানোর কোনো রাস্তা নাই, তখন আমি বাড়ির উঠানে গিয়ে ডাক দিলাম, 'ফজল, বাড়ি আছ?'

বাড়ির ভেতরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল, হঠাৎ করে সব কথা থেমে গেল। ভেতর থেকে কুপি হাতে ফজলের মা বের হয়ে এলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

'আমি, খালাম্মা। মতিউর।'

ফজলের মা কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তখন কাশেম

আর মুকাদ্দেস চারটা রাজাকারকে নিয়ে দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। আমি ভেতরে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শুনলাম, একটা মেয়ে মনে হলো চিৎকার করে কেঁদে উঠল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সবাই মিলে ফজলকে দুই দিক থেকে ধরে বের করে নিয়ে এল। আমার হাতে ছয় ব্যাটারির একটা টর্চলাইট ছিল, সেইটা ফজলের মুখে মারতেই ফজল চোখ পিটপিট করে আমার দিকে তাকানোর চেষ্টা করল, আমি বললাম, 'কী ফজল, কেমন আছ?'

ফজল বলল, 'কে?'

'আমি। আমি মতিউর।'

'ও! মইত্যা রাজাকার।'

আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল, কত বড় সাহস হারামজাদার, আমারে মইত্যা রাজাকার ডাকে! আমি ছয় ব্যাটারির টর্চলাইটা দিয়ে ধরাম করে শালার মাথায় মেরে বসলাম। মাথাটা সরিয়ে নিল বলে লাগল বদমাইশটার কপালে সাথে সাথে আর কপাল ফেটে রক্ত বের হয়ে এল।

তখন ফজলের মা চিৎকার করে ছুটে এসে আমার হাত ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন, বলতে লাগলেন, 'বাবা আমার, সোনা আমার! আমার বুকের ধনটারে নিও না বাবা—তোমার পায়ে পড়ি, বাবা। পোলাটা আমার খেতে বসেছিল, মুখের ভাত রেখে উঠে এসেছে—'

মেয়েলোকের কান্নাকাটি আমার খুব খারাপ লাগে, আমার মেজাজ আরো বেশি গরম হয়ে গেল। কিন্তু হাজার হলেও এক গ্রামের মানুষ, গ্রাম সম্পর্কে খালা ডাকি, বেয়াদবি তো করতে পারি না। তাই গলায় মধু ঢেলে বললাম, 'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, খালা। থানায় নিয়ে খালি একটু কথাবার্তা বলব।'

বোকা মহিলা আমার কথা বিশ্বাস করে ফেলল, বলল, 'সত্যি বলছ বাবা? সত্যি বলছ?'

'খালা, আমি কি আপনার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলব?'

ফজলের মা তখন আমার শরীরে হাত বুলিয়ে দোয়া করতে লাগলেন। বেকুব আর কাকে বলে! আমি বললাম, 'খালাম্মা, ফজল একটা অস্ত্র নিয়ে আসছিল।'

ফজলের মা আমতা আমতা করে বললেন, 'কী অস্ত্র?'

'আপনি জানেন খালা কী অস্ত্র।'

মহিলা তখন ভয় পেয়ে গেলেন, ফ্যাসফ্যাস করে কাঁদতে শুরু করলেন, বললেন, 'না বাবা কোনো অস্ত্র নাই—বিশ্বাস করো, তুমি বিশ্বাস করো।'

আমি তখন জিব দিয়ে চুক চুক করে শব্দ করে বললাম, 'অস্ত্র দেবেন না? ভাঁজ করলে ছোট ছোট হয়ে যায়, সেই অস্ত্রটা দেবেন না?'

মহিলা বোকা হলেও এটুকু জানে, এই অস্ত্রসহ ধরা পড়লে ফজলের অবস্থা একেবারে ছ্যাড়াবেড়া! তাই ঘ্যান ঘ্যান করে বলতে লাগলেন কোনো অস্ত্র নাই। আমি তখন খুব রাগ হওয়ার ভান করে বললাম, 'ঠিক আছে খালা, তাহলে আমরাই বার করি।' তারপর মুকাদ্দেসরে বললাম, 'এই ফজল্যারে আচ্ছা মতোন বানা'।

আমার কথা শেষ করার আগেই মুকাদ্দেস রাইফেলের বাঁট দিয়ে ফজলের বুকে মেরে বসল, ফজল উল্টে পড়ে যেতেই সাথে সাথে তার পেটে একটা লাথি। ফজল যন্ত্রণার শব্দ করে গড়িয়ে যেতেই আরেকটা লাথি মাথার মধ্যে, তখন ফজলের দুইটা বোন একেবারে ছুটে এসে ফজলরে ধরে বাঁচানোর চেষ্টা করল। আমি গলায় একেবারে মধু ঢেলে বললাম, 'বোনডি, তোমরা ভেতরে যাও, অস্ত্রটা নিয়ে আসো। আসল মাইর শুরু করলে তোমরা সহ্য করতে পারবা না। যাও বোনডি, অস্ত্রটা নিয়ে আসো।'

আমার কথায় কাজ হলো, ছোট বোনটা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ঘরের ভেতরে ঢুকে যায়। একটু পরে লুঙ্গি দিয়ে প্যাঁচানো একটা স্টেনগান নিয়ে বের হয়ে আসে। দেখে আমার বুকটা ভরে গেল! এরে বলে কপাল। অস্ত্রসহ মুক্তিযোদ্ধা! রূপকথার গল্পে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্বের কথা বলে। এইটা মনে হয় তার থেকেও ভালো। আমি তখন সবগুলিরে বললাম, 'আয় যাই।'

মুকাদ্দেসের কোমরে গামছা ছিল, সে সেটা দিয়ে ফজলের হাত দুইটা বেঁধে নিয়ে পেছন থেকে লাথি মেরে বলল, 'চল মালাউনের বাচ্চা মালাউন ইন্ডিয়ার দালাল!'

ফজলের মা আর বোন হাউমাউ করে কাঁদছে তার ভেতরে আমরা সবাই উঠান থেকে বের হয়ে এলাম। এত রাত্রে চেচামেচি শুনে অনেক মানুষের ভিড় জমে গেছে, এত ভিড়ে থাকা ঠিক না। বড় সড়ক পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই একটা হৈচৈ, তার সঙ্গে চড়চড় শব্দ শুনতে পেলাম। মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি পেছনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। মুকাদ্দেস দাঁত বের করে হেসে

বলল, 'কাশেম শালা কোথাও গেলে আগুন না দিয়ে আসে না। শালার মনে হয় একটা আগুনের রোগ আছে।'

আমি বললাম, 'বৃষ্টিতে সব ভিজে আছে এর মধ্যে আগুন দিল কেমন করে?'

মুকাদ্দেস বলল, 'কাশেম পারে! হাতে জাদু আছে, পানিতেও আগুন লাগিয়ে দেবে।'

মুকাদ্দেসের কথা শুনেই সবাই হি হি করে হাসতে লাগল।

আমি ফজলকে বাকি রাতটা একটা সুপারি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলাম। মুকাদ্দেস আর কাশেম কয়েকবার ছোটখাটো কিলঘুষি আর লাথি দিয়েছে, আমি বাড়াবাড়ি কিছু করতে দেই নাই। মেজর সাহেবের হাতে হাত-পা ভাঙা লুলা একজনকে দিয়ে তো লাভ নাই।

ভোরবেলা দুইটা সিদ্ধ ডিম দিয়া পরাটা খেলাম, সঙ্গে এক কাপ চা। বাজারে চিনির খুব অভাব, গুড়ের চা, খেতে পায়েস পায়েস লাগে। ফজলরেও নাশতা দেওয়া দরকার ছিল, কিন্তু অনেক ঝামেলা, হাত বেন্ধে রেখেছি সেইটা খুলতে হবে। কম বয়সী মাথা গরম পোলাপান, হাত খোলা ঠিক হবে না। ফজলের মা বলেছে, রাত্রেও নাকি খায় নাই, মাত্র খেতে বসেছিল! মরার আগে ভালো করে এক পেট খাওয়ালে খারাপ হতো না—মরে তো যাবে দোজখে, সেইখানে কি আর ভালোমন্দ খেতে পারবে? কিন্তু শালার কপালে খাবার নাই আমি কী করব?

খুব সকালবেলা আমরা রওনা দিলাম, তারপরও গ্রামের মানুষ কীভাবে কীভাবে জানি খবর পেয়ে গেল। বাড়ির উঠানে দাঁড়ায়ে জানালায় ফাঁক দিয়ে, দরজার চিপা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আমাদের। কেউ একটা কথাও বলল না, কিন্তু তবু আমি বুঝতে পারলাম ফজলের জন্য সবার মায়া হচ্ছে। হোক। আর কয়দিন, তারপর বুঝবে মায়া দিয়ে কাজ হবে না। দেশের মানুষ বুঝবে, একটা বড় কাজের জন্য মাঝে-মধ্যে ছোটখাটো কঠিন কাজ করতে হয়।

হাইস্কুলে মিলিটারি ক্যাম্প করেছে, সেইটা গ্রাম থেকে প্রায় দুই মাইল। রাস্তা খারাপ, রিকশা যায় না, পুরো রাস্তা হেঁটে আসতে হলো। যখন স্কুলে

পৌঁছেছি তখন রোদ উঠে গেছে। স্কুলের গেটে চায়নিজ রাইফেল হাতে নিয়ে দুজন সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে। আমি গিয়ে সালাম দিলাম, বললাম, 'ওস্তাদজি। ইয়ে মুক্তি হায়।'

পাকিস্তান মিলিটারি বাংলা ভালো বোঝে না, মুক্তিবাহিনীকে বলে মুক্তি। আমার কথা শুনে হঠাৎ লাফ দিয়ে চিৎকার করে আমাদের দিকে চায়নিজ রাইফেলটা ধরে কী যেন চিৎকার করে উঠল। উর্দু ভাষাটা মোটামুটি জানি, কথাবার্তা বলতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু অনেক মিলিটারি আবার দেখি উর্দুও বুঝে না, পশতু ভাষায় কথা বলে, পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলে! এই মিলিটারি মনে হয় সে রকম, কিছু না বুঝে আমাদেরকেই গুলি করে দেবে। মনে করছে আমরাই মুক্তিবাহিনী। আমি তাড়াতাড়ি হাত-পা নেড়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, আমরা পাকিস্তানি। আমরা রাজাকার বাহিনী। সেন্ট্রি দেখি বুঝতেই চায় না—শেখ মুজিব কী কাজটাই না করেছে, তার জন্য এখন সারা দেশের মানুষের একটা গাদ্দার পরিচয় হয়ে গেছে। বাঙালি চেহারা দেখলেই আর বিশ্বাস করতে চায় না মনে করে মুক্তিবাহিনী। কী লজ্জা!

গেটের কাছে হৈচৈ শুনে ভেতর থেকে বড়সড় একজন মিলিটারি এল, পোশাক দেখে কে কোন পোস্টে থাকে বুঝতে পারি না, এই মিলিটারি মনে হয় সুবেদার হবে—সে উর্দুটা বোঝে। তাকে বললাম যে, আমরা অস্ত্রসহ একটা মুক্তিবাহিনী এনেছি। মেজর সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছি। কোনজন মুক্তিবাহিনী জিজ্ঞেস করলে আমি ফজলরে দেখালাম, তারে দেখে সে বিশ্বাসই করতে চায় না, বলে এর তো মুখে দাড়িই গজায়নি—এ মুক্তিবাহিনী হবে কেমন করে? আমি তখন লুঙ্গি দিয়ে প্যাঁচিয়ে রাখা স্টেনগানটা দেখালাম, তখন বিশ্বাস করল, জিব দিয়ে চুক চুক শব্দ করে গেট খুলে দিল।

ফজলরে নিয়ে আমরা কয়েক পা গিয়েছি হঠাৎ দেখি আমাদের গ্রামের জালু পাগলা। এই জালু পাগলা এই খানে কী করে? জালু পাগলা ফজলরে দেখে অবাক হয়ে গেল। চোখ কপালে তুলে বলল, 'আরে ফজল তুমি।'

পাগল-ছাগলের কথাই আলাদা, কিছু বোঝেসোঝে না। ফজল হচ্ছে অস্ত্র হাতে ধরা একটা মুক্তিবাহিনী, তার সঙ্গে চেনা-পরিচয় থাকাটাও এখন অপরাধ, দেখা হলেও না চেনার ভান করে মুখ বন্ধ করে থাকা দরকার। জালু পাগলারে সেটা বোঝাবে কে? এই পাগলের মন-মেজাজ খারাপ

হলে লুঙ্গিটা খুলে পাগড়ির মতো মাথায় বেন্ধে ফেলে, সে কী আর এই সব বোঝে?

ফজলের অবস্থা কেরোসিন, হাত পেছনে বান্ধা, নিয়ে আসছি পাকিস্তানি ক্যাম্পে। জালু পাগলার সঙ্গে তার খোশগল্প করার অবস্থা নেই। ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তবে পাগল বলে কথা, সে ফজলরে বলে, 'ফজল, আমারে চিনো নাই? আমি জালাল।'

আমার তখন মেজাজ খারাপ হলো, এইটা কি একটা খোশগল্প করার জায়গা? বললাম, 'আরে, জালু পাগলা এইখানে কী করে? যা ব্যাটা, ভাগ!'

জালু পাগলা আমার দিকে তাকিয়ে মুখটা বাঁকা করে ফেলল, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম বিড়বিড় করে বলছে, 'মইত্যা রাজাকার।' একটা দাবড়ানি দিব কি না চিন্তা করতেছি, তখন এই ছাগল বলে, 'মোতি ভাই। এইটা কী ব্যাপার? ফজল ভাইরে বেন্ধে রেখেছেন কেন? খুলে দেন।'

পাগল মানুষের সাহসের কোনো মা-বাপ নাই। আমরা এতজন মানুষ, এতগুলা এক্কেবারে আসল মিলিটারি, তার মধ্যে সে এসে ফজলের হাতটা খুলে দেওয়ার চেষ্টা করল—আমার নিজের চোখরে বিশ্বাস হয় না! বড়সড় মিলিটারিটা এসে তখন পেছন থেকে তার মাজায় একটা লাথি মারল। মিলিটারির লাথির কী জোর! লাথি খেয়ে একেবারে ডিগবাজি খেয়ে শালা উল্টে গিয়ে পড়ল, লুঙ্গি ওঠে উদাম পাছা বের হয়ে গেল। সেই দৃশ্য দেখে হাসতে হাসতে আমাদের অবস্থা খারাপ। সুবেদার সাহেবের দেখি মেজাজ খুব গরম, রাইফেলের বাঁট দিয়ে মনে হয় ঘিলুটাই বের করে ফেলত। আমি তখন সুবেদার সাহেবকে বললাম যে, এই লোক পাগল। সেটা বোঝাতেও একটু সময় লাগল, কিন্তু যখন বুঝে গেল, তখন দেখি তার মেজাজ একেবারে ঠাণ্ডা! পা দিয়ে জালু পাগলাকে একটা ঠেলা দিয়ে কী কী বলে আর হাসে!

জালু পাগলার মাথা খারাপ হলে কী হবে, তালে ঠিক আছে। যখন বুঝল তার বিপদ কেটে গেছে তখন দেখি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ফজলের জন্য সালিস করা শুরু করল, উর্দুর উ পর্যন্ত জানে না, কিন্তু দেখি উর্দুতে কথা বলে! তার কথা শুনে আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারি না। তার বক্তব্য হচ্ছে ফজল মানুষ ভালো, সে এক চান্সে মেট্রিক পাস করেছে, তাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। আবার দেখি ইংরেজিও বলে, গুডম্যান! কোত্থেকে এই ইংরেজি শিখেছে কে জানে! সুবেদার সাহেব জালু পাগলার কথা শুনে খুব মজা পেয়ে

গেল, সে দেখি খালি হাসে। আমি তখন জালু পাগলাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললাম, 'যা পাগলা, ভাগ এখান থেকে।'

জালু পাগলা তাও সরতে চায় না, ভুলভাল উর্দুতে ফজলের জন্য সুপারিশ করতে থাকে, খালি তা-ই না নিজের বুকে থাবা দিয়ে বলে সে নাকি জয়বাংলা না, সে নাকি পাকিস্তানি। পাগল-ছাগল মানুষ, সে জয়বাংলার কী বোঝে আর পাকিস্তানেরই বা কী বোঝে!

যা-ই হোক শেষ পর্যন্ত সুবেদার সাহেব আমাদের নিয়ে মেজর সাহেবের কাছে রওনা দিল। মেজর সাহেবের অফিসের সামনে গিয়ে ভেতরে খবর দেওয়া হলো। মেজর সাহেব তখন আমাদের ডেকে পাঠালেন। আমাকে আর ফজলকে নিয়ে সুবেদার সাহেব ভেতরে ঢুকল।

ঘরটা পর্দা দিয়ে ঢাকা। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, টেবিলের ওপরে কিছু কাগজপত্র, একটা ম্যাপ। টেবিলের পেছনে মেজর সাহেব বসে আছেন, চেয়ারটা খুব সুন্দর, কাঠের মধ্যে অনেক রকম কারুকাজ করা। এই এলাকায় খুব অবস্থাবান হিন্দু ফ্যামিলি ছিল, মনে হয় তাদের কোনো বাড়ি থেকে আনা হয়েছে। ঘরের এক কোনায় একটা ইজি চেয়ার, ইজি চেয়ারের ওপরে একটা বেল্ট, বেল্টের সঙ্গে লাগানো একটা রিভলভার। মেজর সাহেবের টেবিলে একটা গ্লাস, সেই গ্লাসে মনে হয় ফলের রস। মেজর সাহেব কিছু একটা লিখছিলেন, আমরা যখন ঢুকলাম তখন মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকালেন। আমি হাত তুলে সালাম দিলাম, কিন্তু মেজর সাহেব সালামের উত্তর দিলেন না, ভুরু কুঁচকে ফজলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমনিতেই মেজর সাহেবের চেহারা খুব সুন্দর, গায়ের রঙ একেবারে দুধের মতো সাদা, গালে গোলাপি আভা। মাথার চুল আর গোঁফ কুচকুচে কালো, চেহারার সঙ্গে গোফটা এত সুন্দর মানিয়েছে যে বলার মতো না।

মেজর সাহেব কিছু বললেন না, তাই আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, তাকে দেখে কেমন জানি ভয় হয়, বুকের ভেতরে এক ধরনের কাঁপুনি হয়। বেশ কিছুক্ষণ ফজলের দিকে তাকিয়ে থেকে মেজর সাহেব চোখ সরিয়ে নিলেন, টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে দিয়াশলাই দিয়ে সিগারেটে আগুন দিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে উর্দুতে বললেন, 'একে খুলে দাও।'

আমি বললাম, 'স্যার ইয়ে মুক্তি হায়, উসকো পাছ হাম লোগ আর্মস ভি পায়া থা।'

আমি লুঙ্গি দিয়ে প্যাঁচানো স্টেনগানটা দেখানোর চেষ্টা করলাম, মেজর সাহেব হঠাৎ চাপা গলায় কেমন যেন বাঘের মতো গর্জন করে উঠলেন, 'ইসকো খুল দো।'

আমার হঠাৎ ভয়ে সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল। স্টেনগানটা সুবেদার সাহেবের হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি করে ফজলের হাতটা খুলে দিতে চেষ্টা করলাম। গামছা দিয়ে মুকাদ্দেস এত শক্ত করে বেঁধেছে যে, খুলতে আমার রীতিমতো পরিশ্রম করতে হলো। বাঁধনটা খুলে দেওয়ার পর ফজল তার হাতটা সামনে নিয়ে আসে, হাতের আঙুল কয়েকবার খুলে আর বন্ধ করে তারপর এক হাত দিয়ে অন্য হাতকে টিপতে থাকে। হাতের জায়গায় জায়গায় কালো রক্ত জমে গেছে। ফজলের সাহস দেখে আমি অবাক হলাম, সে মেজরকে বলল, 'থ্যাংক ইউ।'

মেজর সাহেব ফজলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাকে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন, আমাকে কিছু বললেন না। ফজল চেয়ারে বসে দ্বিতীয়বার বলল, 'থ্যাংক ইউ।'

এবারে মেজর সাহেব উত্তর দিলেন, বললেন, 'ইউ আর ওয়েলকাম।'

আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। আমি যে একজন জলজ্যান্ত মানুষ দাঁড়িয়ে আছি সেইটা তার চোখেই পড়ল না? মেজর সাহেব তার সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ফজলকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি মুক্তিবাহিনী?'

ফজল কোনো কথা না বলে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি হড়বড় করে বিষয়টা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম, মেজর সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি?'

তার বরফের মতো ঠাণ্ডা গলার স্বর শুনে আমার আত্মা উড়ে গেল, আমি শুকনো গলায় বললাম, 'না।'

'তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করব তখন আমার কথার উত্তর দেবে। দ্বিতীয়বার নিজে থেকে কথা বললে আমি তোমার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলব।'

মেজর সাহেবের কথা শুনে চন্‌ন্ করে আমার মাথা ঘুরে গেল—এই মানুষের মধ্যে গোলমাল আছে, আমি একটা ভুল করলে আমার অবস্থা শেষ। আমার হঠাৎ মনে হলো ফজল যে রকম বিপদে আছে এর সামনে আমিও সে রকম বিপদে আছি।

মেজর সাহেব আবার ফজলের দিকে তাকালেন, ইংরেজিতে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি একজন মুক্তিযোদ্ধা?'

ফজল কোনো কথা না বলে কী রকম করে জানি মেজর সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'পানি খাব।'

'পানি?'

'হ্যাঁ।'

মেজর সাহেব সুবেদারকে বললেন, 'একে এক গ্লাস পানি দাও।'

সুবেদার সাহেব ঘরের কোনায় রাখা একটা পানির কুঁজো থেকে পানি ঢেলে ফজলকে এক গ্লাস পানি দিল। ফজল ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে পুরো পানিটা খেয়ে ফেলল। মেজর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'আরো?'

ফজল মাথা নাড়ল। সুবেদার সাহেব তখন তাকে আরো এক গ্লাস পানি দিল। ফজল সেইটাও ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল। তারপর আমরা কেউ কিছু বোঝার আগে হড়হড় করে বমি করে দিল। মেজর সাহেব ফজলের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, আমার মনে হলো বুঝি রেগে উঠবেন কিন্তু রাগলেন না। বরং মনে হতে লাগল ফজলের জন্য বুঝি তার এক রকম মায়া হচ্ছে।

মেজর সাহেব সুবেদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি এর সঙ্গে একলা কথা বলতে চাই।'

সুবেদার মাথা নাড়ল, মনে হলো একটু অবাকও হলো, কিন্তু কিছু বলল না।

'একজন সুইপারকে পাঠাও ঘরটা পরিষ্কার করার জন্য।'

সুবেদার বলল, 'ইয়েস স্যার।' তারপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মেজর সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে উর্দুতে বললেন, 'তুমিও বাইরে অপেক্ষা করো।'

আমি তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লাম, বললাম, 'জি আচ্ছা স্যার।'

আমি বাইরে যাচ্ছিলাম তখন মেজর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

'মতিউর।' আমি হড়বড় করে বললাম, 'মতিউর রহমান।'

মেজর সাহেব ইংরেজিতে বললেন, 'চমৎকার একটা কাজ করার জন্য তোমাকে অভিনন্দন মতিউর।'

এই প্রথম আমার বুকের ভেতর একটা সাহস ফিরে এল। এতক্ষণ মেজর সাহেবের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল একটা জ্যান্ত মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে এনে আমিই যেন দোষ করে ফেলেছি! আমি বললাম, 'থ্যাংক ইউ সার।' বলে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, চলে গেলাম না।

মেজর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কিছু বলতে চাও?'

'ইয়েস স্যার।'

'বলো।'

আমি কথাটা ঠিক কীভাবে বলব বুঝতে পারলাম না। মেজর সাহেবের যা মেজাজ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে না বলে সোজাসুজি বলাই মনে হয় ভালো। আমি বললাম, 'আমি জিহাদে অংশ নিতে চাই স্যার।'

মেজর সাহেব ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি হঠাৎ একটু নার্ভাস হয়ে গেলাম, আমতা আমতা করে বললাম, 'একটা কাফেরকে কতল করে—'

মেজর সাহেব আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'এই ছেলেকে তুমি নিজের হাতে মারতে চাও?'

মেজর সাহেব এত তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলবেন আমি একবারও চিন্তা করি নাই। মাথা নেড়ে বললাম, 'জি স্যার। আপনি যদি আমাকে অর্ডার দেন—'

হঠাৎ করে মেজর সাহেবের মুখটা রাগে কী রকম জানি হয়ে গেল, চিৎকার করে বললেন, 'গেটআউট। গেট আউট ইউ বাস্টার্ড। ইউ ব্লাড-থার্স্টি ম্যানিয়াক।'

আমি কোনোমতে নিজের জানটা নিয়ে বের হয়ে এলাম। বাইরে কাশেম আর মুকাদ্দেস দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে এইভাবে বের হতে দেখে কাশেম জিজ্ঞেস করল, 'কী হইছে মোতি ভাই।'

আমি বললাম, 'কিছু হয় নাই।'

'মেজর সাহেব এইভাবে ধামকি দিলেন কেন?'

আমি চোখ লাল করে বললাম, 'আর একটা কথা বলবি তো দাঁত ভেঙে ফেলব হারামজাদা।'

কাশেম আর কথা বলার সাহস পেল না।

আমরা বারান্দায় অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। এক সময় দেখলাম, একজন মিলিটারি মেজর সাহেবের ঘরে ঢুকল। কিছুক্ষণ পর ফজলকে নিয়ে বের হয়ে এল। সুবেদার সাহেব আর দুজন মিলিটারি তখন ফজলকে নিয়ে খালের পাড়ে নিয়ে যেতে লাগল। আমরা তখন উঠে দাঁড়ালাম, ব্যাপারটা দেখা দরকার।

তখন মেজর সাহেব তার ঘর থেকে বের হলেন। কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন, কিছু একটা চিন্তা করে খালের দিকে হাঁটতে লাগলেন। মেজর সাহেবকে দেখে সবাই দাঁড়িয়ে গেল, স্যার তখন তাদের পার করে সামনে গেলেন। আমরা পিছে পিছে গেলাম। খালের পাড়ে কে যেন বসে আছে—হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, কী আশ্চর্য! মানুষটা জালু পাগলা। জালু পাগলার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম, হাত-পা নেড়ে মেজর সাহেবের সঙ্গে কথা বলছে। মনে হলো মেজর সাহেব হাত দিয়ে একটা চড় দিয়ে সবগুলো দাঁত খুলে ফেলবেন, কিন্তু কিছু করলেন না। একটা সিগারেট ধরালেন, সিগারেট ধরিয়ে আবার ফিরে আসতে লাগলেন। আমি একটু আড়ালে সরে গেলাম, মেজর সাহেবের চোখের সামনে পড়ার সাহস নাই।

আমি খালের দিকে তাকালাম। ফজলকে নিয়ে খালের পাড়ে দাঁড়া করিয়েছে দূর থেকে তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না। কাফেরের বাচ্চা কাফের, ইন্ডিয়ার দালালি করো? হারামজাদার কলমা মনে আছে কি না কে জানে? মনে থাকলেই কী, আল্লাহ কি কোনো দিন এদের মাফ করবে?

মিলিটারিটা গুলি করল, দূর থেকে ভালো করে দেখা গেল না।

শুধু মনে হলো কলাগাছের মতো পড়ে গেল ফজল, পানি ছিটকে উঠল একটু। হাতটা নড়ল কয়েকবার, তারপর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যে মিলিটারিটা গুলি করেছে সেইটা খালের কাছে গিয়ে পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে লাশটা ছুটিয়ে দিল, পানিতে ভেসে গেল লাশটা। মিলিটারি দুজন কথা বলতে বলতে ফিরে আসছে। মনে হয় কিছুই হয় নাই।

আমি কাশেম আর মুকাদ্দেসকে বললাম, 'আয় যাই।'

কাশেম বলল, 'চলেন মোতি ভাই। খেল খতম। পয়সা হজম।'

আমি ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ দেখি মেজর সাহেব স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে হাত তুলে ডাকলেন। আমি ভয়ে ভয়ে কাছে গেলাম। মেজর সাহেব বললেন, 'মতিউর।'

'ইয়েস স্যার।'

'তোমার কী মনে হয়, ইস্ট পাকিস্তান কি কোনোদিন স্বাধীন হতে পারবে?'

'না স্যার। ইমপসিবল।'

'আমারও তা-ই ধারণা। তবে—'

মেজর স্যার শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ করে বললেন, 'তবে যদি স্বাধীন হয়ে যায়, তা হলে একদিন তারা আমাদের ক্ষমা করে দেবে। কিন্তু তোমাদের কোনোদিন ক্ষমা করবে না।'

মেজর সাহেব হঠাৎ হাসতে লাগলেন। স্যারের চেহারা এত সুন্দর, হাসলে আরো সুন্দর দেখায়। স্যারের সঙ্গে সঙ্গে আমিও হাসব কি না, বুঝতে পারলাম না।

মেজর সামশেদের কথা

ম্যাপ দেখে আসলে কিছু বোঝা যায় না। আমরা যেখানে ক্যাম্প করছি সেই জায়গাটার ম্যাপ দেখেও প্রথমে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, জায়গাটাকে নিজের চোখে দেখে এখন বুঝতে পারছি কাজটা কঠিন। যে শত্রুকে দেখা যায় তার সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়, যাকে দেখা যায় না তার সঙ্গে যুদ্ধ করে কেমন করে? কিন্তু এখন তা-ই করতে হচ্ছে, যার জন্য ধরে নিতে হচ্ছে সবাই শত্রু। এর চেয়ে খারাপ অবস্থা আর কী হতে পারে? কেউ মুখে বলে না, কিন্তু আমি জানি এখানকার একেবারে প্রত্যেকটি মানুষ আমাদের ঘেন্না করে। কী ভয়ঙ্কর অবস্থা!

তার মধ্যে আমাদের থাকতে হবে। বর্ডারের আউটপোস্টগুলোতে শক্ত করে ঘাঁটি গেড়ে বসা হয়েছে, যত তাড়াতাড়ি করা যাবে মনে করা হয়েছিল তত তাড়াতাড়ি করা যায়নি। অনেক সময় লেগেছে। সাপ্লাই লাইন এখনো খুব নাজুক, এই আছে তো এই নেই। এখন দেশের ভেতর জায়গা বেছে বেছে ক্যাম্প করা হচ্ছে, এই জায়গাটা বেছে নেওয়া হয়েছে চিন্তা-ভাবনা করে। বর্ডারের কাছে সেটা একটা কারণ, সাপ্লাই লাইনের কাছে সেটা আরেকটা কারণ।

একটা স্কুলের ভেতর ক্যাম্প করেছি। আশপাশে গাছ আর গাছ। গ্রামের মানুষ ধরে এনে সকাল থেকে গাছ কাটা হচ্ছে। তারপর বাঙ্কার বানাতে হবে। পেছনে একটা খাল আছে, সেটা একটা প্রাকৃতিক নিরাপত্তা, তবে এই দেশের লোক দেখি পানিতেই থাকে, সেটা আমাদের জন্য উল্টো সমস্যা হবে কি না কে জানে। আমি ম্যাপটা সামনে নিয়ে পুরো এলাকাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। তখন আমার ব্যাটম্যান এসে বলল, আমার সঙ্গে কয়েকজন দেখা করতে এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে? সে বলল স্থানীয় রাজাকাররা একটা মুক্তিবাহিনীকে ধরে এনেছে, অস্ত্রসহ। শুনে আমি একেবারে লাফিয়ে উঠলাম,

বলে কী! এখানে আসার পরই খোঁজ পাচ্ছি একটা মুক্তিযোদ্ধার দল এই এলাকায় নেমেছে। দলটা কোনোভাবেই আমাদের জন্য মিলিটারি-আতঙ্ক না। দশ-বারোজনের একটা দল কিছু হালকা অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শান্তি কমিটির দুজন মেম্বারকে মেরে ফেলেছে—খুবই কাপুরুষের মতো কাজ, যুদ্ধ করতে এলে মিলিটারির সঙ্গে যুদ্ধ করো, সিভিলিয়ানকে মারবে কেন? পরশুদিন মনে হয় একটা থানাকেও আক্রমণ করেছে। বিশেষ কিছু করতে পারেনি, তবুও তো আক্রমণ। সবচেয়ে বড় যেটা ঝামেলা করেছে সেটা হলো, রাস্তার একটা ব্রিজ উড়িয়ে দিয়েছে। কিছু রাজাকার ছিল তারা কিছু করতে পারেনি, পুরো রিপোর্ট পেলে বুঝতে পারব, মনে হয় রাজাকারগুলো কিছু করেনি ভয়েই পালিয়েছে। রাজাকার বাহিনীটা ঠিকভাবে দাঁড় করানো যাচ্ছে না, শিক্ষিত মানুষ কম। এ দেশে এমনিতেই শিক্ষিত কম, যারা ছিল তারা সবাই হয় আওয়ামী লীগ না হলে কমিউনিস্ট। জামাতে ইসলামীর স্টুডেন্ট ফ্রন্টটা থাকায় রক্ষা।

আমি ব্যাটম্যানকে বললাম যারা দেখা করতে এসেছে তাদের ভেতরে নিয়ে আসতে। এই ক্যাম্পে এসেছি মাত্র দু দিন, এর মধ্যে একটা মুক্তিবাহিনী দেখে ফেলা কম ভাগ্যের কথা না!

ঘরের পর্দা ঠেলে প্রথমে আমাদের সুবেদার গুল আফরাজ, তার পেছনে একটা কমবয়সী ছেলে এবং সবার শেষে রাইফেল কাঁধে একজন যুবক এসে ঢুকল। আমি মুক্তিযোদ্ধাটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু আর কেউ এসে ঢুকল না। আমি তখন চোখ ফিরিয়ে এনে দেখলাম কমবয়সী ছেলেটির হাত পেছনে বাঁধা এবং চোখের ওপর কপালে খানিকটা জায়গা কেটে শুকনো রক্ত জমে আছে। এটি তাহলে মুক্তিযোদ্ধা! এই বাচ্চা ছেলে? আমি হতবাক হয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলাম—ঠিক এর বয়সী আমার একটা ছেলে লাহোর ইস্পাহানি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, আর এই ছেলে যুদ্ধ করছে? ছেলেটা ঠিক প্রকৃতিস্থ না, আশপাশে কী হচ্ছে বুঝতে পারছে বলে মনে হলো না, এক ধরনের শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি জানতাম, ইস্ট পাকিস্তানের তরুণরা গেরিলা ওয়ারফেয়ার শুরু করেছে। তাই বলে এ ধরনের তরুণ? এত কমবয়সী? একজন মুক্তিযোদ্ধা দেখার জন্য আমি যে রকম আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম, হঠাৎ করে আমার সেই আগ্রহ উবে গেল—আমার নিজেকে প্রতারিত মনে হলো। আমি যখন যুদ্ধ করব তখন আমার

প্রতিপক্ষ হবে আমার মতো একজন। এ রকম একটি কিশোরের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব কেমন করে?

আমি আবার ছেলেটার মুখের দিকে তাকালাম, মুখে শুধু ভয় আর আতঙ্ক নয়, এর মধ্যে যন্ত্রণারও একটি চিহ্ন আছে। হাতগুলো বেঁধেছে খুব শক্ত করে, ব্লাড সার্কুলেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে হাতের বাঁধন খুলে দিতে বললাম।

সঙ্গী রাজাকার যুবকটিকে দেখে বাঙালি মনে হচ্ছে, আমি যত দূর জানি এই এলাকায় কোনো বিহারি নেই, সে পরিষ্কার উর্দুতে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে এই ছেলেটি আসলে ভয়ঙ্কর। এর হাত খুলে দিলে বিপদ হতে পারে। আমি তখন তাকে একটা ছোট ধমক দিলাম এবং ধমক খেয়ে সে কেঁচোর মতো কুঁকড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি ছেলেটির হাতের বাঁধন খুলে দিল। হাতগুলো খোলার সঙ্গে সঙ্গে হাতে ব্লাড সার্কুলেশন করার জন্য সে আঙুলগুলো খুলতে ও বন্ধ করতে শুরু করে এবং আমার দিকে প্রায় কৃতজ্ঞতার চোখে তাকিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' উচ্চারণটি খারাপ না, মনে হয় পড়াশোনা জানে। আমার ঠিক কী মনে হলো জানি না, আমি ছেলেটাকে আমার সামনের খালি চেয়ারে বসতে বললাম। এই অসম্ভব ক্লান্ত, ভয়ার্ত এবং আতঙ্কিত ছেলেটি চেয়ারে বসে দ্বিতীয়বার আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

আমি অনেকটা অভ্যাসবশত বলে ফেললাম, 'ইউ আর ওয়েলকাম।' চুপ করে থাকাটাই আসলে যুক্তিসঙ্গত হতো।

আমি আমার ছেলের বয়সী কিশোরটির দিকে তাকিয়ে রইলাম, আমার এখনো বিশ্বাস হতে চায় না যে এই বয়সী ছেলেপিলে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নেমেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি মুক্তিবাহিনী?'

এখানে খুব যুক্তিসঙ্গত কাজ হতো এটি অস্বীকার করা, আল্লাহ-খোদা, পীর-পয়গম্বরের নাম নিয়ে কসম কেটে অস্বীকার করা। বাসায় কীভাবে অস্ত্রটি এসেছে সেটি জিজ্ঞেস করলে বলা যে, কেউ শত্রু তা করে সেটি তার বাসায় রেখে গেছে। আমি দেখেছি পলিটিশিয়ানরা সব সময় এগুলো করে, পরিষ্কার একটি সত্য ঘটনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে ফেলে। কিন্তু ছেলেটি পলিটিশিয়ান না। একটা ঘটনাকে চোখ বন্ধ করে অস্বীকার করা এখনো শেখেনি, সে চুপ করে রইল। তবে রাজাকার যুবকটি কথা বলা শুরু করল এবং

তখন আমি প্রথমবার একটু বিরক্ত হলাম। এ রকম রাজাকার যুককদের আমি প্রত্যেক দিনই দেখি, জ্যান্ত একটা মুক্তিবাহিনী কালেভদ্রে ধরা পড়ে—আমার রাজাকার নিয়ে কোনো কৌতূহল নেই, মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আছে। আমি তখন তাকে কিছু জিজ্ঞেস না করলে মুখ খুলতে নিষেধ করে দিলাম। ভাষাটি মনে হয় একটু কঠিন হয়ে গেল, কারণ দেখলাম তার মুখটা ভয়ে একেবারে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আমি ধরে আনা ছেলেটিকে আবার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি মুক্তিযোদ্ধা?'

ছেলেটি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বাংলায় পানি খেতে চাইল। ধরা পড়ার পর নিশ্চয়ই এর ওপর ধকল কম যায়নি। রাজাকারগুলো ছেলেটাকে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু খেতে দেয়নি। আমি গুল আফরাজকে এক গ্লাস পানি দিতে বললাম। পানিটা এক নিঃশ্বাসে খেয়ে সে দ্বিতীয় এক গ্লাস পানি খেতে চাইল। খালি পেটে একসঙ্গে এত পানি খেতে দেওয়াটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না—এবং আমার সন্দেহটা পুরোপুরি সত্যি প্রমাণ করে ছেলেটা বমি করে দিল। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, এ রকম একটা দুর্বল শরীর নিয়ে এরা মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে! ছেলেটার সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার, এই দুজন দাঁড়িয়ে থাকলে খোলাখুলি কথা বলা যাবে না। আমি দুজনকে চলে যেতে বললাম, গুল আফরাজ সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে গেল। তবে রাজাকার যুবকটির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো সে কিছু একটা কথা বলতে চায়। যত কমবয়সী ছোট বাচ্চাই হোক, একটা সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধাকে অস্ত্রসহ ধরে নিয়ে এসেছে সেটি কম কথা নয়, তাকে অভিনন্দন দিয়ে কিছু একটা বলা উচিত। আমি তার নাম জিজ্ঞেস করলাম, তারপর এ রকম একটা কাজ করে ফেলার জন্য তাকে অভিনন্দন জানালাম। দেখলাম আনন্দে তার চোখ চকচক করছে, কিছু একটা বলার জন্য সে ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে, কিন্তু সাহস করে বলতে পারছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কিছু বলতে চাও?'

'ইয়েস স্যার।'

'বলো।'

যুবকটা একটু ইতস্তত করে যে কথাটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমাকে বলল সেটা শুনে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল, সে নিজের হাতে এই ছেলেটিকে মারতে চায়। সারা দেশে একটা আর্মি অপারেশন হচ্ছে, ইচ্ছায় হোক

অনিচ্ছায় হোক মানুষ মারা যাচ্ছে, আর এই হতভাগা এই হত্যাকাণ্ডকে একটা ব্যক্তিগত স্ফূর্তি হিসেবে নিতে চায়? আমার ইচ্ছে করল এর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলি, অনেক কষ্ট করে রাগ সামলে তাকে ধমক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলাম। রক্তলোলুপ পশু কোথাকার!

সুইপার এসে আমার ঘরটা পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। ছেলেটা চুপচাপ চেয়ারে বসে আছে। টেবিলে কনুই রেখে দু হাত দিয়ে মাথার চুল ধরে রেখেছে। আমি টেবিলে রাখা গ্লাসের হুইস্কিটা এক ঢোকে শেষ করে ইংরেজিতে বললাম, 'তোমার কী মনে হয়? তোমরা দেশ স্বাধীন করতে পারবে?'

ছেলেটা আমার কথার উত্তর দিল না, বলল, 'তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলবে?'

আমার একটু হাসি পেল, দেশ স্বাধীন করার মতো বড় বড় ব্যাপার এখন ছেলেটার কাছে অর্থহীন, এখন তার মূল প্রশ্ন তাকে আমার কী করব? বাঁচিয়ে রাখব, নাকি মেরে ফেলব। আমি বললাম, 'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি।'

'কী প্রশ্ন?'

'তোমরা কি এই দেশ স্বাধীন করতে পারবে?'

ছেলেটি কোনো কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'পারবে?'

ছেলেটি হঠাৎ একটু অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কেন আমাকে এটা জিজ্ঞেস করেছ?'

'তুমি একটা ইন্ডিয়ান এজেন্ট, তোমাকে আমরা ধরেছি—তোমাকে আমরা যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারি।'

ছেলেটার মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে গেল। বলল, 'আমি ইন্ডিয়ান এজেন্ট না।'

'তুমি ইন্ডিয়ান এজেন্ট।'

'না।' ছেলেটা হঠাৎ যেন ভুলে গেল সে কোথায় আছে, কার সঙ্গে কথা বলছে। কেমন জানি রেগে উঠে বলল, 'তুমি খুব ভালো করে জানো আমরা ইন্ডিয়ান এজেন্ট না।'

'তাহলে তোমরা কী?'

ছেলেটা একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা তাহলে কী?'

ছেলেটা আমার চোখের দিকে তাকাল। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, 'তুমি কি আমাকে টর্চার করবে?'

'দরকার হলে করব।'

ছেলেটা একটা নিঃশ্বাস ফেলল, তার মুখে স্পষ্ট একটা ভয়ের ছাপ পড়ল! আমি বললাম, 'জেনেভা কনভেনশনের নাম শুনেছ?'

ছেলেটা মাথা নাড়ল। আমি বললাম, 'জেনেভা কনভেনশনে বন্দি সৈনিকদের টর্চার করা যায় না। কিন্তু তোমরা বন্দি সৈনিক না। তোমাদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিনি। তোমরা ফালতু মানুষ। তোমরা দুষ্কৃতকারী। তোমাদের আমরা যা খুশি করতে পারি।'

আমি ঠিক জানি না কেন আমি আমার ছেলের বয়সী একটা বাচ্চা ছেলেকে এভাবে এসব বলছি। কিন্তু আমি থামতে পারলাম না, বললাম, 'তোমার নখ একটা একটা করে আমি টেনে তুলতে পারি। সিগারেট দিয়ে তোমার অণ্ডকোষে ছ্যাঁকা দিতে পারি। তোমার পা দড়ি দিয়ে বেঁধে আমি ঝুলিয়ে রাখতে পারি। তোমার মাথা আমি পানির বালতিতে ডুবিয়ে রাখতে পারি। আরো শুনতে চাও?'

ছেলেটা মাথা নাড়ল। ফিসফিস করে বলল, 'না।'

'কেন শুনতে চাও না? ভয় করে?'

ছেলেটা মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ, ভয় করে।'

আমি আমার গলার স্বর একটু পরিবর্তন করলাম। বললাম, 'ঠিক আছে যাও। আমি তোমাকে টর্চার করব না। কেন করব না জানো?'

ছেলেটি চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, 'দেশে ঠিক তোমার বয়সী আমার একটা ছেলে আছে।' আমি মানিব্যাগ খুলে তাকে আমার ছেলের ছবি দেখালাম, ক্রিকেট ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, 'তার নাম হচ্ছে সাগির। তোমাকে দেখে আমার সাগিরের কথা মনে হচ্ছে।'

ছেলেটা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি মানিব্যাগে রাখা সাগিরের ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'সাগির ইস্পাহানি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। ভেরি গুড স্টুডেন্ট। ক্রিকেট খেলায় খুব উৎসাহ। একদিন

সে খুব বড় মিলিটারি অফিসার হবে।' আমি ছেলেটার দিকে তাকালাম। বললাম, 'আর তুমি? তুমি কোনো ধানক্ষেতের ফার্টিলাইজার হবে। মাছের খাবার হবে। তোমার ডেডবডি নদীতে ভাসবে। আমরা যখন তোমাকে গুলি করে মারব তখন কারো সাহস হবে না তোমার ডেডবডি কবর দেওয়ার। তুমি যেই দেশের জন্য যুদ্ধ করছ, সেই দেশের মাটিতে তোমার কবর হবে না। বুঝেছ?'

ছেলেটি মাথা নাড়ল, সে বুঝেছে। একটু আগে তাকে খুব বিচলিত দেখাচ্ছিল, এখন মনে হচ্ছে সে নিজেকে সামলে নিচ্ছে। আমার নিজের ওপর একটা রাগ উঠে যায়। রাগ সামলে গলার স্বর ঠাণ্ডা করে বললাম, 'তবে তোমাকে আমি জানে বাঁচার একটা সুযোগ দিতে চাই।'

ছেলেটার চোখ হঠাৎ আশায় জ্বলজ্বল করে উঠল, বলল, 'কী সুযোগ?'

'তুমি যদি রাজাকার বাহিনীতে যোগ দাও, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব!'

ছেলেটার চোখের জ্বলজ্বলে ভাবটা দপ করে নিভে গেল। আমি বললাম, 'তোমাকে আমি রাজাকার কমান্ডার বানিয়ে দেব। তুমি আমাদের ফোর্সের সঙ্গে যাবে, ইন্ডিয়ান এজেন্টদের ধরে আনবে। এই খালের পাড়ে দাঁড় করিয়ে তাদের গুলি করবে। পারবে না? আজকে এখানে দশগ্রামের মানুষ আছে তাদের সবার সামনেই শুরু করবে, ঠিক আছে?'

ছেলেটা দাঁতে দাঁত চেপে অনেক কষ্ট করে নিজেকে সংযত করল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'তুমি বলেছিলে তুমি টর্চার করবে না!'

আমি থতমত খেয়ে বললাম, 'আমি কি তোমাকে টর্চার করছি? আমি তোমার সঙ্গে শুধু কথা বলছি।'

ছেলেটি আমার কথার কোনো উত্তর দিল না। আমি শেলফের পেছনে লুকিয়ে রাখা হুইস্কির বোতলটা বের করে অল্প একটু হুইস্কি ঢেলে সেটাতে চুমুক দিয়ে বললাম, 'তাহলে তুমি এই সুযোগটা নেবে না?'

ছেলেটা কোনো উত্তর দিল না। আমি বললাম, 'তোমাকে দেখে আমার বারবার সাগিরের কথা মনে পড়ছে। এটা খুব সুন্দর একটা গল্প হতো, যদি আমি তোমাকে ছেড়ে দিতাম। লাহোরে গিয়ে আমি আমার ছেলেকে বলতাম, ঠিক তোমার বয়সী একটা ছেলেকে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম।' আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ইমোশন থেকে দেশ অনেক বড়। আমার দেশকে আমি টুকরো হতে দিতে পারি না। আজকে এখানে

দশগ্রামের লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সামনে আমরা তোমাকে গুলি করে মারব। এই দশগ্রামের লোক জানবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আর ইসলামের বিরুদ্ধে যদি কেউ একটা আঙুলও তোলে তাহলে তাকে আমরা শেষ করে দেব। বুঝেছ?' আমি এক ঢোকে বাকি হুইস্কিটা শেষ করে শব্দ করে গ্লাসটা টেবিলে রাখলাম।

ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি নিশ্চিত, সে আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেনি। এই বয়সের ছেলেরা এক ধরনের সস্তা রোমান্টিসিজম থেকে এ রকম গেরিলা যুদ্ধের মতো এমন ছেলেমানুষি কাজ করে, পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবতা বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই! আমি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি।

ছেলেটাকে কোথায় গুলি করা হবে জায়গাটা আমি দেখে এলাম। এটা হবে আমাদের প্রথম প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ড। কাজটা ঠিকভাবে করা দরকার। আমি নিশ্চিত, ভবিষ্যতে আরো অনেকবার এখানে অনেক মানুষকে দাঁড় করানো হবে, কিন্তু প্রথমটার একটা অন্য রকম গুরুত্ব রয়েছে।

আমি যখন স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। ঠিক কী কারণ জানি না, সাগিরের বয়সী ছেলেটাকে দেখার পর থেকে ভেতরে কেমন জানি অস্থির লাগছিল, গুলির শব্দটি অস্থিরতাটুকু কমিয়ে দিল। ছেলেটিকে আর ভুগতে হবে না, জ্বালা-যন্ত্রণা সব শেষ হয়ে গেছে। আমি নিজের ভেতরে এক ধরনের শান্তি অনুভব করতে থাকি। সবাইকেই তো বিদায় নিতে হবে। কেউ আগে আর কেউ পরে, এই তো পার্থক্য।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়েছি, তখন দেখলাম রাজাকার যুবকটি হাঁটছে। মুখটা একটু বিমর্ষ—নিজের হাতে ছেলেটাকে খুন করতে পারেনি, সে জন্যই কি? আমি হাত তুলে ডাকলাম। সে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল। ঠিক কী কারণ জানি না, আমার ইচ্ছে করল হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে এর মুখে একটা আঘাত করি। কিন্তু সেটা ঠিক হবে না, চারদিকে অনেক মানুষ। অনেকেই আমাকে দেখছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কি মনে হয় ইস্ট পাকিস্তান কোনোদিন স্বাধীন হবে?'

তার মুখে একটা নাটকীয় ভাব ফুটে উঠল। প্রায় স্লোগান দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'না স্যার, ইমপসিবল।'

আমি যুবকটির চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তবে যদি স্বাধীন হয়ে যায় তাহলে একদিন তারা হয়তো আমাদের ক্ষমা করে দেবে, কিন্তু তোমাদের কোনোদিন ক্ষমা করবে না।'

যুবকটির মুখটি অপমানে বিবর্ণ হয়ে গেল। গালে চড় মারার থেকে এটি খুব খারাপ হলো না।

ঠিক কী কারণ জানি না, হঠাৎ আমার হাসি পেয়ে যায়। আমি রাজাকার যুবকটির দিকে তাকিয়ে হাসতে শুরু করি, কিছুতেই আর হাসি থামাতে পারি না।

সেপাই সরফরাজের কথা

তাসগুলো হাতে নিয়েই আমার মেজাজটা গরম হয়ে গেল, পরপর তিনবার এই রকম হাত? যদি প্রত্যেকবার এই রকম হাত পড়ে তাহলে মানুষ খেলবে কেমন করে? আমি ভুরু কুঁচকে ফতে খানের দিকে তাকালাম, এই বানচোত তাস বাটার সময় কি কিছু নটঘট করেছে? এর মতো মিচকে শয়তান আল্লাহর দুনিয়ায় কম আছে, এর অসাধ্য কোনো কাজ নাই।

আমি খেলব, না তাসগুলো রেখে দেব সেটা চিন্তা করছি। তখন সুবেদার গুল আফরাজের গলা শুনলাম, 'দুইজন তাড়াতাড়ি।'

ফতে খান জিজ্ঞেস করল, 'কেন সুবেদার সাহেব?'

'একটা মুক্তিকে গুলি করতে হবে।'

ফতে খান কনুই দিয়ে আমাকে খোঁচা মেরে বলল, 'তুমি যাও। মুক্তিরে গুলি করলে দেখবে তোমার ভাগ্য ভালো হয়ে যাবে। এর পর থেকে ভালো তাস পাবে।' আমি সন্দেহের চোখে ফতে খানের দিকে তাকালাম, সে জানল কেমন করে আমার হাত খারাপ?

সুবেদার সাহেব আবার বললেন, 'ডাবল মার্চ। কুইক।'

আমি আর মানজার উঠে দাঁড়ালাম। হারামির বাচ্চা ফতে খান উঠবে না, ভালো হাত পেয়েছে নিশ্চয়ই।

খালের ধারে গিয়ে দেখি অনেক মানুষ, কোনটা মুক্তি বুঝতে পারলাম না। খালের কাছে একজন বসে আছে, মেজর সাহেবকে দেখে লাফ দিয়ে দাঁড়াল, এইটাই কি মুক্তি নাকি? মনে হয় না, মেজর সাহেব হাত নেড়ে কী বললেন আর লোকটা পেছনে চলে গেল। আরো কিছু বাঙালি আশপাশে। কোনোটারই হাত বাঁধা নেই, চোখ বাঁধা নেই। দেখে মনে হয় সবাই রঙ-তামাশা দেখতে এসেছে। কোনটা তাহলে মুক্তি? কোনটাকে গুলি করতে হবে? যা-ই হোক সেইটা আমার মাথাব্যথা না। আমার সামনে একজন দাঁড়া করাবে, আমি

তাকে গুলি করব। কাকে গুলি করব, কখন গুলি করব সেইটা নিয়ে আমার এত চিন্তা কিসের?

আমি খালের পাশে এসে দাঁড়ালাম। এই জায়গাটা ভালো, একটু নিচু হয়ে নেমে গেছে। মানুষটাকে দাঁড়া করানো সুবিধা, নিজে থেকে যদি খালে না পড়ে যায়, পা দিয়ে একটু ধাক্কা দিলেই লাশ খালে ডুবে যাবে। আমি আমার চায়নিজ রাইফেলটা পরীক্ষা করে দেখলাম, আজকে সকালেই তেল দিয়ে পরিষ্কার করেছি। ম্যাগজিনটা দেখে লোড করে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিয়ে আসে না কেন মুক্তিটাকে, একবার ভালো হাত পেলে ফতে খানকে আচ্ছা মতন শিক্ষা দিতে হবে। আমার সঙ্গে মশকরা করে।

আস্তে আস্তে সবাই পেছনে সরে যাচ্ছে। আমি মানজারকে দেখলাম, একটা মানুষকে নিয়ে আসছে। এইটা নিশ্চয়ই মুক্তিটা হবে, নিজে নিজে হেঁটে আসছে। লক্ষণটা ভালো, মাঝে-মধ্যে টেনে-হিঁচড়ে আনতে হয়, তখন সময় নষ্ট হয়। মুক্তিটা ভালো মানুষের মতো দাঁড়াল, কোনো ঝামেলা করল না। আমি মনে মনে একটা হিসাব করলাম, গুলি খাওয়ার পর একটু লাফিয়ে নিচে পড়বে—খামাখা জায়গাটা রক্তে মাখামাখি হবে। দুই পা পিছিয়ে খালের পানিতে দাঁড়ালে সবচেয়ে ভালো হয়। আমি মুক্তিটাকে একটু পেছানোর ইঙ্গিত করলাম কিন্তু সে ঠিক বুঝল না আমি কী বলছি। তখন মানজার মুক্তিটাকে একটু ঠেলে আরো পেছনে নিয়ে গেল, পানিতে পা রেখে দাঁড়াল। মানজার আমার কাছে এসে বলল, 'সব ঠিক আছে সরফরাজ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আসব?'

'না লাগবে না।'

আমি সুবেদার গুল আফরাজের দিকে তাকালাম, সুবেদার সাহেব মাথা নাড়লেন। আমি রাইফেলটা ওপরে তুললাম—সবচেয়ে ভালো হয় মাথায় মারলে, একেবারে সঙ্গে সঙ্গে কাজ শেষ। কিন্তু মাথাটা ছোট গুলি মিস হতে পারে। আমার হাত ভালো, মিস হবে না, কিন্তু দরকার কী রিস্ক নেওয়ার? এইজন্য আমি বুকে মারি, রিস্ক কম। ফতে খান শালা বহুত হারামি, দুই সপ্তাহ আগে যখন মালাউনদের একটা দলকে আমরা শেষ করলাম তখন ইচ্ছে করে মেয়েগুলোর পেটে গুলি করল। না মরে তখন সেইগুলি তড়পায় আর ফতে খান হি হি করে হাসে। সুবেদার সাহেবকে তখন কাছে গিয়ে একটা একটা করে মাথায় গুলি করে মারতে হলো।

আমি বুকে নিশানা করে গুলি করলাম, শরীরটা একবার লাফিয়ে উঠল, দুইটা হাত সামনে নিয়ে এল যেন গুলিটা হাত দিয়ে থামিয়ে ফেলবে—সব সময় এটা করে। কেন যে করে এইটা একটা রহস্য। মুক্তির শরীরটা একটু ঘুরে ঝপাং করে খালে পড়ে গেল। নিখুঁত কাজ, কোনো ভুল হয়নি, সুবেদার সাহেব মাথা নাড়ছেন দেখতে পেলাম। আমি খালের কাছে গেলাম, মুক্তির মাথাটা ডুবে গেছে। লাল রক্তে পানিটা একটু গোলাপি হয়ে গেছে, মানুষের রক্তের জন্য আল্লাহ এত সুন্দর একটা রঙ দিয়েছেন! মুক্তির পা-টা মাটিতে আটকে আছে, আমি আমার বুটটা যেন না ভিজে যায় সেইভাবে সাবধানে ধাক্কা দিয়ে শরীরটা ছুটিয়ে দিলাম—সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা পানিতে তলিয়ে গেল।

মানজার একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার কাছে আসে, আমি রাইফেলটা পিঠে ঝুলিয়ে বললাম, 'আচ্ছা মানজার, ফতে খান সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়?'

'কী সম্পর্কে?'

'তাস বাটা সম্পর্কে। শালা কি চোট্টামি করে তোমার মনে হয়।'

মানজার মাথা নাড়ল, বলল, 'শালা বহুত হারামি। এর সঙ্গে পাচপাত্তি খেলাই ঠিক না।'

আমরা যখন আবার খেলতে বসেছি ফতে খান জিজ্ঞেস করল, 'মারলি মুক্তিরে?'

কার্ডগুলো হাতে নিয়েই আমার মনটা ভালো হয়ে গেল, দুইটা টেক্কা! আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'হিন্দু না মুসলমান?'

আমি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। হাতে তাসগুলো সাজাতে সাজাতে বললাম, 'কী আসে যায়? সব এক।'

মুক্তিযোদ্ধা ফজলের কথা

রায়হান ভাই বললেন, 'না ফজল, কাজটা মনে হয় ঠিক হবে না।'

আমি বললাম, 'বেশিক্ষণ লাগবে না রায়হান ভাই। খালি দেখা করেই চলে আসব।'

রায়হান ভাই বললেন, 'তোমাদের কুসুমখালি গ্রামের অবস্থা খুব খারাপ। কাছেই হাইস্কুলে মিলিটারি ক্যাম্প করেছে। সারা গ্রাম খালি দালাল আর রাজাকারে গিজগিজ করছে।'

খোকন বলল, 'তোমার ফ্যামিলিরও সরে যাওয়া উচিত।'

রায়হান ভাই বললেন, 'তোমাদের গ্রামে নাকি একটা মোতি রাজাকার আসছে, অসম্ভব নটোরিয়াস।'

আমি বললাম, 'আগেরবার পালিয়ে গিয়েছিলাম, বিদায় নিয়ে যেতে পরি নাই। মা নাকি খালি কান্দাকাটি করে। কোনদিন মরেটরে যাব মনে একটা আফসোস থাকবে! এত কাছে আসছি খালি একবার দেখা করে আসব।'

রায়হান ভাই তবুও রাজি হতে চাইলেন না, বললেন, 'তোমাকে সবাই চিনে, কিছু একটা হয়ে যাবে। গুছিয়ে একটা চিঠি লিখে দাও তোমার মাকে, আমি পৌঁছে দেই।'

আমি হাসার চেষ্টা করে বললাম, 'আমার মা লেখাপড়া জানে না, অশিক্ষিত মানুষ—চিঠি দিয়ে লাভ নাই।' আমি অনুনয় করে বললাম, 'রাত্রিবেলা একেবারে অন্ধকার হলে যাব, কয়টা কথা বলেই চলে আসব। এক ঘণ্টা, ম্যাক্সিমাম দুই ঘণ্টার মামলা।'

রায়হান ভাই শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। বললেন, 'ঠিক আছে আমরা রওনা দিয়ে দিচ্ছি, রহমতগঞ্জে আমরা অপেক্ষা করব।'

আমি স্টেনগানটা খুলে রায়হান ভাইয়ের হাতে দিলাম, রায়হান ভাই কী যেন ভাবলেন। ভেবে বললেন, 'এইটা তোমার কাছেই রাখো। কখন কী বিপদ হয়!'

আমার মনটা ভালো হয়ে গেল, যখন এইটা শিউলি আর পারভীন দেখবে কী রকম অবাক হয়ে যাবে! মায়ের কথা জানি না, সারাক্ষণই কান্নাকাটি করবেন, মনে হয় অস্ত্র দেখিয়ে শান্ত করা যাবে না।

সন্ধের পর আমি রওনা দিলাম। আমাকে চৈতিপাড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিল গফুর আর সালাউদ্দিন। এইখানে নদীটা পার হলেই কুসুমখালি গ্রামের শুরু। আলাউদ্দিনের দূরসম্পর্কের এক ভাই আছে, সে নৌকা করে আমাকে নদী পার করে দিল, এখন থেকে আমি একা। তাতে কোনো সমস্যা নাই, আমি এই গ্রামের ছেলে, আমার চোখ বেন্ধে দিলেও আমি যে কোনো জায়গায় যেতে পারব। সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে সরকারবাড়ি পর্যন্ত আসার পর ঝুম বৃষ্টি নামল। একদিক দিয়ে ভালো। এই বৃষ্টিতে কেউ আর বের হবে না। এমনিতেও রাত হয়ে গেছে, রাস্তায় কোনো মানুষ নেই। কাদায় ছপ ছপ করে হেঁটে যাচ্ছি, এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না একটু পরেই মায়ের সঙ্গে দেখা হবে। শিউলি আর পারভীনের সঙ্গে দেখা হবে। বুকের ভেতরে যে একটু ভয় ভয় করছে না তা না। এই গ্রামে নাকি এখন দালাল আর রাজাকারে গিজগিজ করছে!

সুখেন্দুদার বাড়িটা পার হতেই আমাদের বাড়ির তালগাছটা দেখতে পেলাম। এর জোড়া তালগাছটা বাজ পড়ে পুড়ে গেছে—আমার এখনো মনে আছে যে রাতে এই গাছটার ওপর বাজ পড়ল তখন কী শব্দ, মনে হয় কানের কাছে কেউ একসঙ্গে একশটা দুই ইঞ্চি মর্টার মেরে দিয়েছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে আমি পেছনে সুখেন্দুদার বাড়ির দিকে তাকালাম, কোন দালাল এইটা দখল করেছে কে জানে। সুখেন্দুদার বাবা কত যত্ন করে বাড়ির চারপাশে কত রকম গাছ লাগিয়েছিলেন, এখন সেই বাড়িটা ভূতের বাড়ির মতো পড়ে আছে। হঠাৎ আমার মনে হলো একটা জ্বলন্ত বিড়ির লাল আলো এক সেকেন্ডের জন্য জ্বলে উঠল। এই মাঝরাতে এই বাড়িতে কে বসে আছে? আমার বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল। যে-ই থাকুক, এই অন্ধকারে আমাকে নিশ্চয়ই দেখতে পারে নাই। আমি তাড়াতাড়ি হেঁটে বাড়ির উঠানে ঢুকে গেলাম। আবছা অন্ধকারের মধ্যেও চারদিক পরিচিত মনে হয়। আমি আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে দরজায় টোকা দিলাম। ভেবেছিলাম হয়তো ডাকাডাকি করতে হবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গলা শুনতে পেলাম, 'কে?'

'আমি মা, আমি ফজল।'

মনে হলো মা ভেতরে পাগলের মতো হয়ে গেলেন। আমি শুনতে পেলাম

ধড়মড় করে বিছানা থেকে নামছেন, অন্ধকারে ছুটে এসে দরজাটা খুললেন, তারপর মানুষ যেভাবে ছোট বাচ্চাদের আদর করে সেইভাবে আমাকে জাপটে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। আমি ফিসফিস করে বললাম, 'আস্তে! মা আস্তে!'

'তুই এখনো বাঁইচা আছস!' মা শুধু আমার শরীরে হাত বুলায় আর বলে, 'তোর শরীরের কোথাও গুলি লাগে নাই? কোথাও গুলি লাগে নাই? খোদার কসম?'

আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পরি না, কোনোমতে বললাম, 'মা, আমার শরীরে গুলি লাগলে আমি এইখানে আসি কেমন করে?'

পারভীন আর শিউলিও ঘুম থেকে উঠেছে, তারা হারিকেনের আলোটা উসকে দিয়ে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। পারভীন বলল, 'এ্যাঁ ভাই! তুমি চুল কাটো না কেন?'

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পরি না যে এত দিন পরে কত কষ্ট করে আমি আজ নিশুতি রাতে দেখা করতে এসেছি আর পারভীনের প্রথম কথা হচ্ছে আমি কেন চুল কাটি না! আমি বললাম, 'দিব একটা থাপ্পড়।'

পারভীন হি হি করে হেসে বলল, 'ভাই তোমারে দেখতে একটা গুণ্ডার মতো লাগছে।'

মা বললেন, 'তোর সব কাপড় দেখি ভিজা—খোল, অসুখ করবে পরে।'

আমি বললাম, 'মা, অসুখ করবে না। আমি রাতের পর রাত ভিজা কাপড়ে অ্যামবুশ করার জন্য বসে থাকি।'

শিউলি বলল, 'অ্যামবুশ কী?'

আমি বললাম, 'এখন এই মাঝরাতে তোকে অ্যামবুশ শিখাতে হবে?'

মা বললেন, 'কথা পরে। কাপড় বদলা।'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না মা, আমার সময় নাই। আমি শুধু দেখা করতে এসেছি। এক্ষুনি চলে যাব।'

মা অবাক হয়ে বললেন, 'এক্ষুণি চলে যাবি মানে?'

'মানে এক্ষুনি চলে যাব। আমাদের দলের সবাই রওনা দিয়ে দিয়েছে। আমার গিয়ে তাদের ধরতে হবে।'

'তুই কয়দিন থাকবি না?'

'পাগল হয়েছ? তুমি জানো কুসুমখালি গ্রামে কত রাজাকার?'

মায়ের খুব মন খারাপ হলো। বললেন, 'আজ রাতটাও থাকবি না?'

'না মা। এই তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলে চলে যাব।'

মনে হলো হঠাৎ করে মা কেমন যেন শান্ত হয়ে গেলেন। পারভীনকে বললেন, 'চুলাটা ধরা।' তারপর শিউলিকে বললেন, 'তুই যা, লাল মুরগিটা ধরে নিয়ে আয়।'

আমি বললাম, 'এই রাত্রিবেলা মুরগি কোথা থেকে ধরে আনবে?'

মা আমার কথায় কোনো কান দিলেন না। আলনা থেকে আমার একটা লুঙ্গি আর শার্ট বের করে দিলেন। এমনভাবে সাজানো আছে যেন আমি এখানেই থাকি। একটা গামছা দিলেন মাথা মোছার জন্য। আমি আর আপত্তি করলাম না, মাথা মুছে শুকনো কাপড় পরে রান্নাঘরে বসলাম। দুইটা চুলো জ্বালানো হয়েছে, একটাতে ভাত অন্যটাতে মুরগির মাংস। ডাল আর সবজি আগে থেকে রান্না করা ছিল, শুধু গরম করে নেওয়া হয়েছে। রান্না করতে করতে মা গল্প করছেন, আমি যে কয়দিন ছিলাম না তখন গ্রামে কী হয়েছে তার গল্প। দেশে এত বড় একটা যুদ্ধ চলছে কিন্তু তার ভেতরে মায়ের গল্পগুলো একেবারেই অন্যরকম। কার মেয়ের বিয়ে হলো, কার ছেলে হয়েছে, চালের দাম কত, চোখ ওঠার রোগ হয়েছে, শিউলির পড়াশোনায় মন নাই— মায়ের গল্প শুনলে কে বুঝবে এই দেশের ওপর দিয়ে এখন এ রকম যুদ্ধ চলছে। গল্প করতে করতে মা বললেন, 'যাবার আগে তোর ছোট চাচাকে দেখে যাবি না?'

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, 'না, মা। ছোট চাচাকে এখন ঘুম থেকে তুললে সবাই উঠে যাবে, মহাঝামেলা হয়ে যাবে।'

'তোর চাচা শুনে মনে কষ্ট পাবে।'

'তুমি বুঝিয়ে বলে দিও।'

'আমি বোঝালেই কি বুঝবে, তোর বাপ মরে যাওয়ার পর তোদের নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছে।'

পারভীন হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, 'ছোট চাচা ভাইরে দেখলে, দড়ি দিয়ে তালগাছটার সঙ্গে বেন্ধে রাখবে যেন ভাই আর যেতে না পারে। তোমারে মুক্তিবাহিনী হওয়াটা বোঝাবে তখন।'

শিউলিও মাথায় নাড়ল, বলল, 'সেইটা ঠিক। চাচা সকালে একবার দুপুরে একবার আর রাতে একবার তোমারে গালি দেয়।'

মা বললেন, 'আর প্রতিদিন যে ফজলের জন্য চার রাকাত নফল নামাজ পড়ে সেইটাও বল। আর তোর চাচা কি ভুল বলে? ঠিকই তো বলে, দেশরে স্বাধীন তোকেই করতে হবে কেন? আর মানুষ নাই দেশে?'

এটা নিয়ে তর্ক করে কোনো লাভ হয় নাই দেখে আগের বার কিছু না বলে পালিয়েছিলাম। আবার সেটা শুরু করার কোনো ইচ্ছা নাই বলে আমি কোনো কথা বললাম না। খালি মুখটা হাসি হাসি করে রাখলাম, ছোট বাচ্চাদের কথা শুনে বড়রা মুখ যে রকম হাসি হাসি করে রাখে অনেকটা সে রকম। পারভীন বলল, 'ভাই তোমার বন্দুকটা দেখাবে?'

'বন্দুক?' আমি হেসে বললাম, 'গাধা এটাকে বন্দুক বলে না। এটার নাম স্টেনগান।'

'এত ছোট? এটা তো খেলনার মতো!'

'নিয়ে আয় খুলে দেখাই।'

পারভীন লুঙ্গি দিয়ে প্যাঁচানো স্টেনগানটা নিয়ে এল, আমি খুলে দেখালাম। কেমন করে ম্যাগজিন লোড করে, কেমন করে গুলি করে দেখিয়ে যখন আবার পেঁচিয়ে রাখছি তখন পারভীন জিজ্ঞেস করল, 'ভাই, তুমি কাউকে মেরেছ?'

মা একটা ধমক দিয়ে বললেন, 'এইটা আবার কী রকম কথা?'

পারভীন বলল, 'যুদ্ধ করলে মানুষ মারতে হয় না?'

মা বললেন, 'বন্ধ কর এইসব কথা। প্লেটগুলো ধুয়ে আন।'

আমি যখন খেতে বসেছি তখন তিনজন আমার পাশে বসেছে। আমি বললাম, 'তোমরা খাবে না মা?'

'আমরা খেয়ে শুয়েছি, তুই খা।'

আমাদের ভেতরে পারভীন একটু ভালোমন্দ খেতে পছন্দ করে। আমি বললাম, 'শিউলি আর পারভীন তোরা দুইজন আয়। মানুষ আবার একলা একলা খায় কেমন করে?'

দুজনই মাথা নাড়ল। আমি বললাম, 'পারভীন তুই একটা প্লেট আন। আমি একা একা খাব না।'

পারভীন প্লেট আনার জন্য উঠে দাঁড়াল, ঠিক তখন আমি শুনলাম কে যেন উঠান থেকে বলল, 'ফজল, বাড়ি আছো?'

মুহূর্তে আমরা যে যেখানে আছি সেখানে পাথরের মতো স্থির হয়ে গেলাম।

আমার মনে হলো হঠাৎ করে আমার চারপাশের সবকিছু ভেঙেচুরে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে শুরু করেছে। আমি মায়ের দিকে তাকালাম, মায়ের মুখটা ফ্যাকাশে ও রক্তহীন। আমি বুঝে গেলাম যে আমি ধরা পড়ে গেছি। আমি বুঝে গেলাম পৃথিবীর আর কোনো শক্তি আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

মা খুব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর কুপি বাতিটা নিয়ে দরজা খুলে বললেন, 'কে?'

আমি শুনতে পেলাম, 'আমি খালাম্মা। মতিউর।'

মতিউর ইসলামী ছাত্র সংঘ করে, শহরে থাকে। এখন গ্রামে এসে রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার হয়েছে। আমার একবার মনে হলো লফিয়ে স্টেনগানটা তুলে নিই, তারপর দেখি কী হয়। কিন্তু পারভীন আর শিউলির মুখ দেখে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে শুনতে পেলাম কয়েকজন ঘরের ভেতরে ঢুকে গেছে। কিন্তু বোঝার আগেই আমি দেখতে পেলাম ঘরের ভেতরে চারজন মানুষ, চারজনের হাতেই রাইফেল, আমার দিকে তাক করে রেখেছে।

আমি খাবারের প্লেট থেকে হাতটা সরিয়ে খুব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। আমাকে এখন খুব সাবধানে সব কিছু করতে হবে। আমার জীবন শেষ কিন্তু মা কিংবা শিউলি আর পারভীনের যেন কিছু না হয়। দুজন রাজাকার ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেলল, এমনভাবে হাতটা পেছনে পেঁচিয়ে ধরল যেন আমি নড়তে না পারি। চারজনে মিলে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে নিয়ে এল। কে যেন চোখে টর্চ লাইট ধরল, টর্চ লাইটের তীব্র আলোতে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আমি চোখ কুঁচকে মানুষটাকে দেখার চেষ্টা করলাম, মানুষটা বলল, 'কী ফজল, কেমন আছ?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে?'

'আমি মতিউর। মতিউর রহমান।'

আমার মুখ ফসকে বের হয়ে গেল, 'ও! মইত্যা রাজাকার।'

সঙ্গে সঙ্গে মোতি রাজাকার টর্চলাইট দিয়ে আমার মাথায় মেরে বসল, আমি কোনোমতে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। টর্চ লাইটটা লাগল আমার কপালে। এক মুহূর্তের জন্য আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম।

আমি দেখতে পেলাম, মা ছুটে এসে মোতি রাজাকারের হাত ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে

শিউলি আর পারভীন কাঁদছে। হৈচৈ শুনে আশপাশের সবাই ঘুম থেকে উঠে আসছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কী হচ্ছে, কোনো একটা বিষয় নিয়ে মোতি রাজাকার আর মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে, কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। সবকিছু আমার কাছে কেমন যেন ঘোরের মতো মনে হচ্ছে। তার মধ্যে হঠাৎ একজন এসে রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মেরে বসল, এক মুহূর্তের জন্য আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, আমি তাল হারিয়ে নিচে পড়ে গেলাম, চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেছে। তার মধ্যে কেউ মনে হলো আমার মাথায় লাথি মারল, নিজের অজান্তেই হাত দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু কোনো লাভ হলো না। হায় খোদা! তোমার কাছে আমি কিছু চাই না, শুধু যেন এইখানে আমার মায়ের সামনে আমাকে গুলি করে না মারে!

আমার চোখের সামনে সব অস্পষ্ট ঘোরের মতো লাগছে, অনেকে কান্নাকাটি করছে, চিৎকার করছে, কেউ কেউ ছুটোছুটি করছে। আমার চোখের ওপর তীব্র টর্চলাইটের আলো, ভালো করে দেখতে পারছি না। মনে হলো শিউলি লুঙ্গি দিয়ে প্যাঁচানো স্টেনগানটা এনে মোতি রাজাকারের হাতে দিয়েছে—ভালোই করেছে, তা না হলে শুধু এটার জন্যই মোতি রাজাকার সর্বনাশ করে ফেলত। এত সুন্দর অস্ত্রটা হাতছাড়া হয়ে গেল, আলাউদ্দিনের খুব লোভ ছিল এই অস্ত্রটার ওপরে কিন্তু রায়হান ভাই দিয়েছিলেন আমাকে।

কে যেন আমাকে টেনে তুলল, হাত দুটো বাঁধল পেছনে—মা আর পারভীনকে মনে হয় আমার কাছ থেকে টেনে সরানো হলো—তারপর কে যেন গালি দিয়ে আমাকে ধাক্কা দিল সামনে। এটাই ভালো—এখান থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাক, মারতেই যদি হয় তাহলে অন্য কোথাও নিয়ে মারুক। মায়ের চোখের সামনে যেন না মারে, আর কিছু আমি চাই না।

আমি হাঁটতে পারছিলাম না, মনে হচ্ছিল বুঝি পড়ে যাব। গত মাসে নৌকায় গিয়েছিলাম একটা অপারেশনে, মনে হচ্ছে সে রকম। যেন ঢেউয়ের মধ্যে একটা নৌকা, সেই নৌকার ওপর দিয়ে হাঁটছি, তাল রাখতে পারছি না, মনে হচ্ছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাব। দলটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, পেছনে তাকিয়ে কী যেন দেখছে, আমিও চেষ্টা করলাম দেখতে, মনে হলো আগুন লেগেছে কোথাও। একজন রাজাকার আগুন লাগানো নিয়ে কী একটা কথা বলল, কথাটা নিশ্চয়ই হাসির কারণ, অন্যেরা সবাই শব্দ করে হেসে উঠল।

আমি কতক্ষণ হেঁটেছি মনে নেই। মাঝে মাঝেই মাথা ঘুরে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়েছি। আমাকে কোথায় নিচ্ছে আমি জানি না, বড় সড়ক ধরে বাজারের পাশে দিয়ে থানার কাছে গার্লস স্কুলের কাছে নিয়ে গেল। গার্লস স্কুলটাকে রাজাকার ক্যাম্প তৈরি করেছে। সেখানে আমাকে একটা সুপারিগাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল। মোতি রাজাকার একজনকে বলল, 'মুকাদ্দিস, তুই এরে পাহারা দিবি। যদি এখান থেকে পালায় তাহলে তোকে ধরে মেজর সাহেবের কাছে দিয়ে দিব।'

কথাটা শুনে মুকাদ্দিস নামের রাজাকারটা খুব মজা পেল মনে হলো। হি হি করে হেসে বলল, 'পালাবে না মোতি ভাই। আমি এরে পিটিয়ে ঠ্যাংটা ভেঙে রাখব, নড়তে পারবে না।'

মোতি রাজাকার বলল, 'না না, এখন কোনো পিটাপিটি নাই।' মুকাদ্দিস নামের রাজাকারটা অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'এইটা কী বললেন মোতি ভাই। একটু হাতের সুখ করতে পারব না?'

'না। কালকে মেজর সাহেবের কাছে একটা লুলা মানুষ নিব নাকি?'

মোতি রাজাকার চলে গেলে মুকাদ্দিস কাছে এসে আমাকে একটা লাথি দিয়ে বলল, 'খবরদার, শব্দ করবি না। শব্দ করলে খুন করে ফেলাব শালা মালাউন।'

আমি জানতাম, যারা হিন্দু তাদের এরা মালাউন ডাকে—আমাকে একটু পরে পরে মালাউন ডাকছে কেন কে জানে। মুকাদ্দিস রাজাকার একটা সিগারেট ধরাল, সিগারেটে দুইটা টান দিয়ে আমার কাছে জ্বলন্ত সিগারেটটা নিয়ে এগিয়ে আসে, ঠিক সেই সময় আরো দুইজন রাজাকার আমাকে দেখতে হাজির হলো বলে বেঁচে গেলাম। তা না হলে আমাকে যে জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে ছ্যাঁকা দিত তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

আমি মেরুদণ্ড সোজা করে বসে আছি। হাত দুটো এত শক্ত করে বেঁধেছে যে মনে হচ্ছে অবশ হয়ে যাবে। অনেক কষ্ট করে মাঝে মাঝে হাতটা নড়িয়ে একটু রক্ত চলাচল করার চেষ্টা করি। আমি একবার আকাশের দিকে তাকালাম, আকাশে আবার মেঘ করেছে, একটু বৃষ্টি হলে হতো, তৃষ্ণায় বুকটা ফেটে যাচ্ছে। মুকাদ্দিস রাজাকার বারান্দায় অন্য দুজন রাজাকারের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে, মাঝে মাঝে হাসাহাসি করছে। আমি তৃষ্ণা আর সহ্য করতে না পেরে বললাম, 'একটু পানি দেবেন?'

মুকাদ্দিস রাজাকার ওঠে এল, তাকে দেখে মনে হলো সে এ রকম মজার কথা জীবনে শোনে নাই। বলল, 'কী বললি? পানি?'

আমি মাথা নাড়লাম। মুকাদ্দিস রাজাকার তার লুঙ্গি ওপরে তুলে বলল, 'নে হা কর।'

একজন নোংরা মানুষ আমার মুখের ওপর পেশাব করে দিতে চাইছে, ঘৃণায় আমার মরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে আমি ঘৃণা, রাগ বা ভয় কিছুই অনুভব করলাম না। মুকাদ্দেস বলল, 'হা কর হারামজাদা।' তারপর হঠাৎ করে আমার চোখে-মুখে পেশাব করে দিল, আমি কোনোমতে আমার মুখ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু লাভ হলো না। মুকাদ্দিসের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুজন রাজাকারও আনন্দে হি হি করে হাসতে লাগল।

ঠিক এ রকম সময় দূরে কোথাও বাজ পড়ল। প্রথমে একটু ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল, তারপর হঠাৎ ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আমি আকাশের দিকে তাকালাম, খোদার মনে হচ্ছে আমার জন্য একটু মায়া হচ্ছে। শুয়োরের বাচ্চার পেশাবটা এখন ধুয়ে নেওয়া যাবে, মুখ হা করে একটু পানি খাওয়া যাবে। খোদা মেহেরবান, তবে মেহেরবানিটা এসেছে অনেক দেরি করে। খোদা, তুমি আরেকটু আগে মেহেরবানিটা করতে পারলে না! আমাকে বাঁচিয়ে দিতে পারলে না?

খুব ধীরে ধীরে চারিদিক আলো হতে শুরু করল। পুরো রাতটা কেটেছে একটা বিভীষিকার মতো। এখন আমার ওপর আরো বড় বিপদ নেমে আসবে কিন্তু তবুও কী আশ্চর্য, আমি দিন হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি! মুকাদ্দিসের আমার পাহারা দেওয়ার কথা কিন্তু এক সময় সেও মুখ হা করে ঘুমিয়ে গেছে, হঠাৎ সে ধড়মড় করে উঠে বসল। লাফিয়ে উঠে আমার দিকে তাকায়। তাকে দেখে মনে হয়, সে সবকিছু মনে করতে পারছে না, এক সময় তার মনে পড়ল সে আমাকে পাহারা দিচ্ছে। তখন সে বারান্দা থেকে নেমে এসে আমার পাঁজরে একটা লাথি দিয়ে বলল, 'শালা শুয়োরের বাচ্চা।'

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে! হেই খোদা, তুমি আমাকে রক্ষা করো। আমাকে বাঁচাও এই জালিমের হাত থেকে!

সূর্য ওঠার পর মোতি রাজাকার তার দলবল নিয়ে এল, রাতের বেলা দেখতে পাইনি, দিনের বেলা সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। আমি গ্রামের বেশির ভাগ মানুষকেই চিনি কিন্তু এদের সবাইকে চিনতে পারলাম না। যাদের চিনতে পারলাম তাদের দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, একেবারে সাধারণ গোবেচারা ধরনের মানুষ ছিল, হাতে একটা রাইফেল নিয়ে হঠাৎ তাদের চেহারা-ছুরৎ পাল্টে গেছে। আমাকে যারা চিনে তারা এসে গালিগালাজ করে যেতে লাগল—মোতি রাজাকার এদের কমান্ডার, আমার গায়ে হাত দিতে নিষেধ করেছে, তারপরেও হঠাৎ হঠাৎ এসে একটা লাথি মেরে চলে যেতে লাগল—আমার নিজেকে আর মানুষ মনে হচ্ছে না। আমি যেন একটা পশু, আমার বোধশক্তি কেমন যেন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। গত রাতে প্রথম যখন ধরেছিল, ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর ভয় কাজ করছিল—আস্তে আস্তে ভেতরটা জানি কেমন নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে, দুঃখ-কষ্ট-ভয় কিছুই আর নেই।

সূর্য বেড়ে ওঠার আগে আগেই মোতি রাজাকার আমাকে নিয়ে রওনা দিল। আমার সামনে-পেছনে কয়েকজন রাইফেল ঘাড়ে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষগুলো এত দুর্বল আর রোগা যে দেখে মনে হচ্ছে রাইফেলের ভারেই তাদের মাজা ভেঙে যাবে। ট্রেনিং নেওয়ার সময় আমরা রাজাকার বাহিনীর কথা শুনেছি, মানুষগুলো যে এ রকম হবে কখনো চিন্তা করিনি।

গার্লস স্কুল থেকে মিলিটারি ক্যাম্প কম করে হলেও দুই মাইল। রাস্তা ভালো না—মাঝে মাঝেই কাদা জমে আছে, হেঁটে যাওয়া রীতিমতো কষ্ট। আমার হাতগুলো পেছনে বেঁধে রেখেছে—হাত পেছনে বেঁধে রাখলে ব্যালেন্স থাকে না, হাঁটার মতো সোজা জিনিসটাও কঠিন হয়ে পড়ে। এক-দুইবার আমি হুমড়ি খেয়ে পড়েও গেলাম, হাত ব্যবহার না করে উঠতেও আবার খুব কষ্ট হলো।

এত ভোরবেলাতেও মানুষজন উঠে গেছে। রাস্তার মোড়ে কিংবা বাসার সামনে সবাই ভিড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রথমে আমি চেষ্টা করছিলাম তাদের চোখে চোখ না ফেলতে, কিন্তু একজন মানুষ হঠাৎ হাত তুলে আমাকে সালাম দিল। মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে গভীর দুঃখের একটা ছাপ, মনে হয় হাউমাউ করে কেঁদে ফেলবে। কী নিয়ে এত দুঃখ, আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি—হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম, তার দুঃখটা আমার জন্য।

এর পর থেকে আমি যতবার দেখলাম মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, ততবার আমি তাদের চোখের দিকে তাকালাম—প্রত্যেকবার আমি দেখলাম, মানুষগুলো বুকে একটা গভীর বেদনা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষগুলো শুধু যে রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে তা নয়—যতবার কোনো বাসার সামনে দিয়ে নিয়ে গেছে আমি দেখেছি, জানালার ফাঁক দিয়ে বা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বাড়ির মেয়েরা, বউ-ঝিরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই চোখগুলোতে একটা গভীর সমবেদনা, একটা ভাষাহীন কষ্ট।

মীর্জাবাড়িটা পার হওয়ার পর খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপর কয়েকটা নতুন পাকা দালান উঠেছে। ছেলেরা শহরে থাকে, গ্রামে বাড়ি পাকা করতে শুরু করেছিল, যুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে কাজ বন্ধ করে ফেলেছে। আমি দূর থেকে দেখলাম, বাসার জানালাগুলো খোলা আর একটা জানালার শিক দুটো ধরে পরীর মতো একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি মেয়েটার দিকে তাকালাম, মেয়েটা চোখগুলো সরিয়ে নিল না; আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ওড়না তুলে হঠাৎ মুখ ঢেকে কাঁদতে আরম্ভ করল। আহা, কী সুন্দর মেয়েটি! যদি ওড়নাটি সরাত আমি আবার মেয়েটিকে দেখতে পারতাম। সত্যি সত্যি মেয়েটি ওড়না সরিয়ে আমার দিকে তাকাল, হঠাৎ মনে হলো কিছু একটা বলবে আমাকে। সর্বনাশ, এই রাজাকারগুলো দেখলে বড় বিপদ হয়ে যাবে! শেষ মুহূর্তে মেয়েটা সামলে নিল, কিছু বলল না, শুধু হাত তুলে একটু নাড়ল।

আমার হাত দুটো পেছনে বাঁধা, আমি হাত নাড়তে পারলাম না, মেয়েটার চোখে চোখ রেখে আমি একটু হাসলাম। ঠিক হাসতে পেরেছি কি না জানি না, কাল রাতের পর থেকে এই প্রথমবার আমি হাসার চেষ্টা করেছি। আমাকে কখন মারবে জানি না, এর ভেতরে আর কখনো কি আমি আর একবার একটু হাসব?

আমি কাদায় পা ফেলে হাঁটতে থাকি, ঠিক কী কারণ জানি না, বুকের ভেতর থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। আহা, কী সুন্দর মেয়েটি! চোখগুলো কী সুন্দর, সেই চোখে কী অবিশ্বাস্য একটি বেদনা! আমার অনেকক্ষণ লাগল বুঝতে, এই বেদনাটি আমার জন্য।

ক্যাম্পের গেটে এসে মোতি রাজাকার একটু বিপদে পড়ে গেল, সে বেশ খাঁটি বিহারিদের মতো উর্দু বললেও গেটে দাঁড়ানো মিলিটারিগুলো উর্দু বুঝতে পারে না, তারা মনে হলো অন্য কোনো ভাষায় কথা বলে। 'মুক্তি' কথাটা

অনেকবার বলা হলো এবং আরো কয়েকটা মিলিটারি আসার পর শেষ পর্যন্ত আমাদের ভেতরে ঢুকতে দিল। আমি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে এই মিলিটারিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি—এই সেই পাকিস্তানি মিলিটারি, যারা এই দেশের লাখ লাখ মানুষকে মেরে ফেলেছে! মারার সময় যাদের একবারও হাত কাঁপেনি, বুক কাঁপেনি! এই সেই মিলিটারি, যাদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করছি? দেশকে স্বাধীন করতে হলে এই এদের প্রত্যেকটাকে একটা একটা করে শেষ করতে হবে? আমি এক ধরনের ক্ষোভ নিয়ে এদের পোশাক আর অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ইস! আমাদের সবার হাতে যদি এ রকম একটা করে অস্ত্র থাকত!

হঠাৎ করে কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'আরে ফজল, তুমি?'

আমাকে ধরেছে গত রাতে—এখন বেশ বেলা উঠে গেছে, এর মধ্যে এই প্রথম একজন মানুষ আমাকে চিনে আমার সঙ্গে কথা বলল! আমাকে চিনে ফেলা এখন খুব বিপদের কথা, এই মানুষটা নিজের ওপর বিপদ ডেকে আনছে কেন? পাগল নাকি? আমি তাকিয়ে দেখি, আসলেই পাগল—আমাদের গ্রামের জালু পাগলা। তার সঙ্গে এখন কোনো কথা বলা ঠিক হবে কি না আমি বুঝতে পারলাম না, আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জালু পাগলা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'ফজল, আমারে চিনো নাই? আমি জালাল।'

মোতি রাজাকার মনে হয় একটু রেগে উঠল, বলল, 'আরে! জালু পাগলা এইখানে কী করে? যা ব্যাটা ভাগ!'

জালু পাগলা সরে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখাল না, বরং খুব ব্যস্ত হয়ে বলল, 'মোতি ভাই, এইটা কী ব্যাপার? ফজল ভাইরে বেন্ধে রেখেছেন কেন? খুলে দেন।' তারপর সে নিজেই এসে আমার হাত খুলে দেওয়ার জন্য গামছাটা ধরে টানাটানি করতে লাগল।

আমার পেছনে ছিল বলে আমি ঠিক দেখতে পারলাম না কিন্তু তখন মনে হলো কেউ একজন তাকে লাথি মেরে নিচে ফেলে দিল। বেচারার লুঙ্গি সরে উদোম হয়ে গেল আর তাই দেখে সবার সে কী হাসি! মোটা একটা মিলিটারি কিছুক্ষণ জালু পাগলাকে ধমকাধমকি করল, মোতি তখন বোঝাল, এই মানুষটা পাগল। মিলিটারিটার রাগ তখন কমে আসে, উল্টো জালু পাগলার সঙ্গে মশকরা করতে শুরু করে। জালু পাগলা যখন বুঝল, তার বিপদ কেটে গেছে তখন চোখ পিটপিট করে উঠে দাঁড়িয়ে আবার আমার জন্য সুপারিশ

করতে থাকে। মোতি রাজাকার ধাক্কা মেরেও তাকে সরাতে পারে না, জালু পাগলা ভুলভাল উর্দুতে কথা বলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিয়ে মোতি রাজাকার ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক কী কারণ জানি না, আমার বুকটা হঠাৎ ভয়ে কেঁপে ওঠে।

অনেকগুলো রাজাকার মিলে আমাকে ধরে আনলেও মেজরের ঘরে ঢোকার সুযোগ পেল শুধু মোতি রাজাকার। মোতি রাজাকার মোটা মিলিটারিটার পেছনে পেছনে আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে মেজরকে একটা সালাম দিল। মেজরটা তার সালামের উত্তর দিল না, কী রকম যেন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হয়, সে আগে কখনো মুক্তিবাহিনী দেখে নাই কিংবা দেখলেও তারা আমার মতো সেটা আশা করেনি। মেজরটি আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমিও তার দিকে তাকিয়ে রইলাম—মানুষটির কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর চেহারা দেখে বুক কেঁপে যায়। একজন মানুষের চেহারা সুন্দর হওয়ার জন্য যা যা দরকার মেজরটির তার সবই আছে কিন্তু ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার জন্য তাকে সুন্দর মনে হচ্ছে না। তাকে মনে হচ্ছে একটা দানব।

মেজরটি মোতি রাজাকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইসকো খুল দো—'

আমি উর্দু ভালো বুঝি না, তাই কী খুলে দিতে বলেছে বুঝতে পারলাম না। মোতি রাজাকার কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, আর সেটা শুনে মেজর কেমন যেন বাঘের মতো গর্জন করে উঠল। মোতি রাজাকার তখন ভয় পেয়ে প্রায় ছুটে এসে আমার হাতের বাঁধন খুলে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। আমি এই প্রথমবার বুঝতে পারছি, মেজরটা আমার হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলেছে। শেষ পর্যন্ত যখন হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছে তখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি আমার ফুলে যাওয়া মোটা মোটা আঙুলগুলো কয়েকবার খুললাম আর বন্ধ করলাম; হাতের মাংসপেশিতে টিপে টিপে রক্ত চলাচল শুরু করানোর চেষ্টা করি, ঝিঁঝি লাগার মতো একটা অবিশ্বাস্য আরাম লাগার অনুভূতি হতে থাকে। আমি প্রায় নিজের অজান্তেই বলে বসলাম, 'থ্যাংক ইউ।' মেজরটি অবশ্য কোনো উত্তর দিল না, আমি আশাও করিনি দেবে।

মেজর আরো কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মনে হলো আমাকে চেয়ারে বসতে বলল, ব্যাপারটি আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। কিন্তু আমি কোনো কিছু পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারছিলাম না, তাই কোনো

কিছু চিন্তা না করে চেয়ারে বসে পড়লাম এবং তখন প্রথমবার বুঝতে পারলাম, আমি কী পরিমাণ ক্লান্ত। মনে হলো আমার ক্লান্তি বুঝি আমার ভয় আর আতঙ্ক থেকেও বেশি। আমি ফিসফিস করে বললাম, 'থ্যাংক ইউ।' আর কী আশ্চর্য! মানুষটি উত্তর দিল, 'ইউ আর ওয়েলকাম।' আমি কী সত্যিই ওয়েলকাম?

আমার ইচ্ছে করছিল, টেবিলে মাথাটা রেখে চোখ বন্ধ করে ফেলি। কেমন যেন একটা ঘোরের মাঝে আছি, আমি কি সত্যিই এখানে? এটা কি আসলে একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন? হঠাৎ কি আমার ঘুম ভেঙে যাবে আর আমি দেখব আমার মা প্লেটে ভাত তুলে দিচ্ছে? আমি কষ্ট করে চোখ খুলে রাখলাম, বুকের ভেতরটা খাঁখাঁ করছে, একটু পানি খাওয়ার জন্য বুকটা ফেটে যাচ্ছে। মেজরটা কিছু একটা বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি কথাটা বোঝার চেষ্টা করলাম, তার আগেই মোতি রাজাকার কিছু একটা বলার চেষ্টা করল। মেজর তাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে খুব জোরে একটা ধমক দেয়—কথাটা বলেছে উর্দুতে, কথাটি আমি বুঝতে পারলাম না—শুধু মনে হলো খুব খারাপ একটা কথা। মেজরটা মনে হয় মোতি রাজাকারকে সহ্য করতে পারছে না।

মেজর আবার আমাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করল। এবারে আমি বুঝতে পেরেছি, আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি কি একজন মুক্তিযোদ্ধা! কী অশ্চর্য প্রশ্ন! কী অর্থহীন প্রশ্ন! আমি যদি বলি না, তাহলে কী আমার পিঠে থাবা দিয়ে আমাকে ছেড়ে দেবে? আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না, হঠাৎ অবাক হয়ে লক্ষ করলাম বলছি, 'পানি খাব।' হ্যাঁ, মুক্তিযোদ্ধা হওয়া থেকে এখন অনেক বেশি দরকার পানি। এক গ্লাস পানি। ঠাণ্ডা পানি!

আমি আশা করিনি আমাকে পানি দেবে। শেষবার যখন পানি চেয়েছিলাম তখন মুসাদ্দিক রাজাকার আমার মুখে পেশাব করে দিয়েছিল। এখন কে পেশাব করবে?

কিন্তু কেউ পেশাব করল না, মোটা মিলিটারিটা আমাকে এক গ্লাস পানি ঢেলে দিল। আমার মনে হচ্ছিল শেষ মুহূর্তে বুঝি পানির গ্লাসটা সরিয়ে নেবে, কিন্তু সরাল না। আমাকে পানিটা খেতে দিল। আমি ঢকঢক করে পুরো পানিটা খেয়ে ফেললাম। মনে হলো ভেতরে আগুন ধরে গেল, এ রকম আরো এক শ গ্লাস পানি খেলে বুঝি শান্তি হবে। মেজর জিজ্ঞেস করল, 'আরো?'

আমি মাথা নাড়লাম। আমাকে আরো এক গ্লাস পানি এনে দিল, সেটা যখন প্রায় শেষ করে এনেছি তখন হঠাৎ করে আমার গা গুলিয়ে এল। ঠিক কী হলো আমি বুঝতে পারলাম না, মনে হলো আমার সমস্ত শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছে, ভেতরে যা ছিল সবকিছু পাক দিয়ে বের হতে চাইল এবং আমি গলগল করে বমি করে দিলাম। আমার তখন মাথা ঘুরছে, সবকিছু কেমন জানি আবছা আবছা দেখছি, মনে হচ্ছে বুঝি তাল হারিয়ে পড়ে যাব। মেজর কথা বলছে মোতি রাজাকারের সঙ্গে, কী নিয়ে কথা বলছে বুঝতে পারছি না। ভালো করে শুনতেও পাচ্ছি না, হঠাৎ করে শুনতে পেলাম মেজর প্রচণ্ড জোরে ধমকে উঠেছে। আমি ভেবেছিলাম আমাকে ধমক দিয়েছে বমি করার জন্য কিন্তু তাকিয়ে দেখলাম আমাকে না, মোতি রাজাকারকে। ধমক খেয়ে তার চোখ-মুখ কেমন জানি কুঁকড়ে গেছে, দেখাচ্ছে একটা ভয় পাওয়া কুকুরের মতো। ঘেয়ো কুত্তার মতো। শালা কুত্তার বাচ্চা।

এর মধ্যে কতক্ষণ সময় কেটে গেছে আমি জানি না, ঠিক কী কারণ কে জানে আমার সময়ের অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে। আমি টেবিলে কনুই দিয়ে দুই হাতে আমার চুল ধরে বসে আছি, মাথার ভেতরটা দপ দপ করছে। আমি শুনতে পেলাম, মেজরটা আমাকে জিজ্ঞেস করছে, 'তোমার কী মনে হয়? তোমরা দেশ স্বাধীন করতে পারবে?'

এটা কী রকম প্রশ্ন? না খেয়ে না দেয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত খালেবিলে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি কি রঙ-তামাশা করার জন্য? এখন তুমি আমার সঙ্গে ভাবের কথা বলো? আমি উল্টো জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলবে?' আমার ইংরেজি খুব খারাপ, প্রশ্নটা ঠিক হলো কি না কে জানে।

মেজর একটু ঝুঁকে বলল, 'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি।' আমি বললাম, 'কী প্রশ্ন?'

শালা মেজর আবার প্রশ্নটা করল, মনে হয় আমার মুখ থেকে আসলেই কিছু শুনতে চায়। আমি উল্টো জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কেন আমাকে এটা জিজ্ঞেস করছ?'

মেজরটা এইবারে রেগে গেল, মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'তুমি একটা ইন্ডিয়ান এজেন্ট, তোমাকে আমরা ধরেছি, তোমাকে আমরা যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারি।'

আমার মাথা ঠিক করে কাজ করছে না, তা না হলে আমি নিশ্চয়ই খুব ভয় পেতাম। আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে বললাম, 'না আমি ইন্ডিয়ান এজেন্ট না।'

'তুমি ইন্ডিয়ান এজেন্ট।'

আমার ভেতরে দপ দপ করছে, কী করছি ঠিক বুঝতে পারছি না, কাজটা ঠিক হচ্ছে না জেনেও আমি বললাম, 'না। তুমি খুব ভালো করে জানো আমি ইন্ডিয়ান এজেন্ট না।'

মানুষটার চোখ জানি কীরকমভাবে জ্বলে উঠল, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'তোমরা তাহলে কী?

আমার টেবিলে থাবা দিয়ে বলা উচিত ছিল, আমরা মুক্তিবাহিনী। কিন্তু তার বদলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি আমাকে টর্চার করবে?'

মুখ ফসকে প্রশ্নটা বের হয়ে গেছে—এই প্রশ্নটা করা ঠিক হয়নি, কারণ মেজর শালা হঠাৎ যেন খেপে গেল। ইংরেজিতে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আমাকে কীভাবে টর্চার করবে সেটা বলতে লাগল। লোকটা নিশ্চয়ই মাতাল, তা না হলে এইভাবে কথা বলে? টেবিলের ওপর নিশ্চয়ই এটা মদের গ্লাস।

আমার মনে হলো এইটা একটা স্বপ্নের দৃশ্য, আমি মেজরের দিকে তাকিয়ে আছি কিন্তু তাকে স্পষ্ট দেখছি না। আমি তার কথা শুনছি কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না। লোকটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আরো শুনতে চাও?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না।'

'কেন শুনতে চাও না? ভয় করে?'

আমি সত্যি কথাটাই বললাম, 'হ্যাঁ, ভয় করে।' এখন তো আর বীরত্ব দেখানোর সময় না, আর আমার কথা শুনে ব্যাটা মনে হয় খুব খুশি হলো। সে আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে, খুশি হবে না কেন? হঠাৎ আমাকে খুব দয়া করছে এ রকম ভান করে বলল, 'ঠিক আছে যাও। আমি তোমাকে টর্চার করব না। কেন করব না, জানো?'

আমি লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, লোকটা বলল, 'দেশে ঠিক তোমার বয়সী আমার একটা ছেলে আছে!' ছেলের কথা শুনেই মেজরের মুখটা কেমন জানি নরম হয়ে পড়ে, আমাকে তার ছেলের ছবি দেখালো। তার ছেলে কত ভালো সেটা সে অনেকক্ষণ আমাকে বোঝাল, তারপর আমি কী খারাপ সেটা বলল! আমাকে গুলি করে মেরে ফেলার পর এই দেশে নাকি আমার কবরও হবে না, কুকুর-বেড়াল আমার লাশ খেয়ে ফেলবে!

আমি লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, আমার হঠাৎ মনে হলো আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি! মনে হতে লাগল আমি কিছু বুঝতে পারছি না, এই মানুষটাকে মনে হতে লাগল একটা রাক্ষস। মনে হলো, এক্ষুনি সে আমার ওপর লাফিয়ে পড়ে আমার গলা কামড়ে ধরবে। আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করি।

হঠাৎ লোকটা একটা আশ্চর্য কথা বলল, আমি একেবারে চমকে উঠলাম। লোকটা বলল, 'তবে তোমাকে আমি জানে বাঁচার একটা সুযোগ দিতে চাই।'

মুহূর্তের জন্য আমার কথাটা অসম্ভব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো। মনে হলো সত্যিই আমাকে ছেড়ে দেবে। আমি গভীর রাতে ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে বলব, 'মা। আমি আবার এসেছি। গতবার লাল মুরগির মাংসটা খেতে পারিনি, এবারে না খেয়ে যাব না।' কিংবা মীর্জাবাড়ির পাশের বাসায়, জানালায় টোকা দিয়ে সেই মেয়েটাকে ডাকব। ডেকে বলব, 'তুমি সত্যিই আমার জন্য মন খারাপ করেছিলে? এই দেখো আমি বেঁচে ফিরে এসেছি।' মেয়েটা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। তখন আমি সাহস করে বলে ফেলব, 'এই মেয়ে, তুমি জানো, তুমি অসম্ভব রূপবতী; তোমার চোখ দুটো দেখলে কমবয়সী ছেলেদের একেবারে মাথা খারাপ হয়ে যাবে?'

এক মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথার ভেতরে কত কিছু খেলে গেল। আমি একটা আশা নিয়ে মানুষটার দিকে তাকালাম, জিজ্ঞেস করলাম, 'কী সুযোগ?'

মেজর বলল, 'তুমি যদি রাজাকার বাহিনীতে যোগ দাও আমি তোমাকে ছেড়ে দেব!'

আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম এই শুয়োরের বাচ্চাটা আমাকে নিয়ে খেলছে। আমাকে তো গুলি করে মারবেই, মারার আগে আমাকে আরেকবার ধ্বংস করে দিতে চায়। আমি জানি আমি যদি বলি, হ্যাঁ, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি রাজাকার বাহিনী হয়ে যাব। মায়েদের সামনে থেকে অভুক্ত ছেলেদের টেনে আনব, তারা যখন পানি খেতে চাইবে তখন তাদের মুখে পেশাব করে দেব; তখন এই শুয়োরের বাচ্চা হা হা করে হাসতে হাসতে বলবে, আমি জানি তুমি কাপুরুষ, তুমি ট্রেইটার, তুমি বিশ্বাসঘাতক! তোমাকে গুলি করার আগে আমি সবাইকে বলব, এই দেখো, এই ইন্ডিয়ান এজেন্ট বাঁচার জন্য কী বলছে, কী করছে! তোমরা

এদের ওপর ভরসা করে ভাবছ এরা তোমার দেশ স্বাধীন করবে? তোমরা পাগল। তোমরা উজবুক।

আমি একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিলাম, গভীর একটা বেদনায় আমার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। আমি মেজরটার দিকে তাকালাম, একটানা বকবক করে যাচ্ছে, অসহ্য লাগছে এর কথাগুলো। আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, 'তুমি বলেছিলে তুমি আমাকে টর্চার করবে না।'

মানুষটি থতমত খেয়ে বলল, 'আমি তোমাকে টর্চার করছি না। আমি তোমার সঙ্গে শুধু কথা বলছি।'

কথা! এগুলো কথা? এই লোকটা কি উন্মাদ? লোকটা কি কিছু বোঝে না? কিছু জানে না? আমি লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা একটা শেলফের পেছন থেকে একটা সুন্দর বোতল বের করে সেখান থেকে গ্লাসে খানিকটা মদ ঢেলে নিল। তারপর আবার কথা বলতে লাগল। আমাকে কীভাবে মারবে, কেন মারবে, কোথায় মারবে এসব কথা। আমি তার কথা শুনতে পাচ্ছি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবকিছু বুঝি থেমে গেছে। আমি চোখ খুলে তাকিয়ে আছি কিন্তু চারপাশে কী ঘটছে কিছুই পরিষ্কার দেখতে পারছি না। সবকিছু পুরোপুরি অর্থহীন মনে হচ্ছে। মাথার ভেতরে দপ দপ করছে, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর একটা আতঙ্কে মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে যাব, মনে হচ্ছে দুই হাতে মাথা ধরে চিৎকার করতে করতে ছুটে যাই—

অনেক কষ্ট করে আমি নিজেকে শান্ত করলাম, এই শুয়োরের বাচ্চাদের আমি বুঝতে দেব না যে আমি ভয় পেয়েছি। কিছুতেই বুঝতে দেব না। ভয়ে, আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে গেলেও আমি মাথা সোজা করে রাখব, চোখ খুলে চোখের দিকে তাকিয়ে থাকব। থাকবই থাকব। হেই খোদা, তুমি আমারে শক্তি দাও। আমারে সাহস দাও।

মেজর জানি কাদের সঙ্গে কথা বলছে, কারা যেন আসছে এবং যাচ্ছে। এক সময় একজন এসে আমার ঘাড়ে হাত রাখল। শক্ত লোহার মতো হাত। আমি নিজের থেকে উঠে দাঁড়ালাম। ঘরের কোনায় মেজর দাঁড়িয়ে আছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে—আমার দিকে দেখছে না, মনে হয় ইচ্ছে করেই দেখছে না, কে জানে হয়তো তার ছেলে সাগিরের কথা ভাবছে। পড়াশোনায় ভালো ক্রিকেট প্লেয়ার সাগির।

মেজরের ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার ছিল, বাইরে আসতেই চোখ একটু ধাঁধিয়ে গেল। কিছুক্ষণেই উজ্জ্বল আলোতে চোখ সয়ে আসে। এই স্কুলটা কতবার দেখেছি—এখন কী অপরিচিত মনে হচ্ছে, যেন আগে কখনো দেখিনি।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। চারপাশে অনেক মানুষ। অনেক মিলিটারি। আমি আকাশের দিকে তাকালাম, একপাশে মেঘ কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। মনে হয় বৃষ্টি হবে একটু পর। যখন বৃষ্টি হবে তখন আমি থাকব না। আমি থাকব না কিন্তু ঠিকই বৃষ্টি হবে, আমার লাশের ওপর বৃষ্টি পড়বে অথচ আমি টের পাব না—ব্যাপারটি আমার কাছে কী অবিশ্বাস্য মনে হয়! আমি স্কুলের সামনে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চারদিকে তাকিয়ে থাকি।

মেজরটি সঙ্গে আরো কয়েকজনকে নিয়ে হেঁটে গেল। কোথায় গিয়েছে কে জানে! আমার ইচ্ছে হলো তাকে ডাকি, ডেকে বলি, শোনো, আমি তোমাকে অভিশাপ দিই—তুমি যে রকম করে আমাকে গুলি করে মেরে আমার লাশ খালে ফেলে দেবে, ঠিক সে রকম কেউ যেন তোমাকে, তোমার ছেলে সাগিরকে, তোমার সব বংশধরকে গুলি করে রাস্তায় ফেলে রাখে। আমার লাশ যে রকম শেয়াল-কুকুরে খাবে, তোমার ছেলে সাগিরের লাশও সে রকম কাক-শকুনে খাবে। ঠুকরে ঠুকরে খাবে, কুরে কুরে খাবে—

আমি নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম, জীবনের শেষ মুহূর্তটিতে আমি কেন উন্মাদ হয়ে যাব? আমি শান্ত থাকব। আমি সাহসী থাকব। হেই খোদা, তোমার কসম লাগে, আমাকে একটু সাহস দাও, আমাকে একটু শক্তি দাও। প্লিজ খোদা, তুমি আমাকে সাহস দাও। দোহাই লাগে তোমার—

চারপাশে খট খট শব্দ হচ্ছিল, অনেক লোক মিলে গাছ কাটছে। স্কুলের চারপাশে কী সুন্দর গাছ ছিল, সব কেটে শেষ করে ফেলবে! এখন হঠাৎ খট খট শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই কি চলে গেছে? আমি তাকালাম। না, কেউ যায়নি। সবাই আছে। সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সবাই স্থিরচোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এত দূর থেকে আমি তাদের চোখ দেখতে পাই না, কী আছে তাদের চোখে? করুণা? ভালোবাসা?

আমি হেঁটে হেঁটে এগোতে থাকি। খুব আস্তে আস্তে যাই। একটি পা ফেলতে যদি এক সেকেন্ড বেশি সময় নিই তাহলে এক সেকেন্ড বেশি বেঁচে থাকব। এক সেকেন্ড বেশি আমি নিঃশ্বাস নেব, এক সেকেন্ড বেশি আমার

হৃৎপিণ্ড বুকের ভেতর ধুকপুক করবে। এক সেকেন্ড! এক সেকেন্ড কত দীর্ঘ সময়, আমি আগে কখনো জানতাম না।

এক সময় আমার পথটা শেষ হয়ে গেল। আমি খালের কাছে দাঁড়িয়েছি। দশ-বারো হাত দূরে একজন সাদাসিধে চেহারার মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বুঝতে পারলাম এই মিলিটারিটা আমাকে গুলি করবে। হঠাৎ করে আমার মাথার ভেতর সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল। মনে হলো আমি চিৎকার করে কাঁদি, চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালাই! আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম। না, কিছুতেই আমি ভেঙে পড়তে পারব না, কিছুতেই না। হেই খোদা, আমার জীবনের শেষ কয়েকটা মুহূর্তে তুমি আমাকে শক্তি দাও। আমাকে আর একটু শক্তি দাও। প্লিজ খোদা, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। তোমার দোহাই লাগে। আমি মাথা সোজা করে থাকতে চাই, আমি চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকতে চাই, রাইফেলের নল থেকে বুলেটটাকে বের হয়ে আসতে দেখতে চাই।

সাদাসিধে মিলিটারিটা হাত নেড়ে আমাকে কিছু বলছে, কী বলছে আমি বুঝতে পারছি না। আমি এখন আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না, কিছু বুঝতে পারছি না। তখন আর একটি মিলিটারি এসে আমাকে ধরে দুই পা পিছিয়ে নিয়ে গেল। আমার পায়ে আমি পানির স্পর্শ পেলাম। আমি একবার আমার পায়ের দিকে তাকালাম, গোড়ালি পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেছে। পায়ের নিচে নরম কাদা—

আমি আবার মাথা তুলে তাকালাম। সাদাসিধে চেহারার মিলিটারিটা আস্তে আস্তে তার রাইফেলটা তুলছে। এখন সে আমাকে গুলি করবে। কোথায় নিশানা করেছে সে? মাথায়, নাকি বুকে? কেমন লাগবে আমার?

আমি স্থিরচোখে রাইফেলের কালো নলের দিকে তাকিয়ে থাকি। একটু আগে কোথায় জানি পাখি ডাকছিল, সেই পাখিটা আর ডাকছে না। নিচু গলায় কথা বলছিল কেউ, সেই শব্দটিও আর নেই। বাতাসে গাছের পাতা পড়ছিল, সেই পাতাও থেমে গেছে। কী আশ্চর্য! কোথাও কোনো শব্দ নেই। কী ভয়ঙ্কর রকম নীরব পুরো পৃথিবী!

আমার সামনে থেকে আস্তে আস্তে সব অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। স্কুলের বিল্ডিংটি দেখতে পাচ্ছি না। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল দুজন মিলিটারি, তারা কোথায়? রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সাদাসিধে মিলিটারিটাকেও আর

দেখতে পাচ্ছি না, শুধু তার রাইফেলটাকে দেখছি। পুরো রাইফেলটাও নয়, শুধু তার নল, কালো নল। আমার দিকে তাক করে আছে একটা কালো নল, আমি চোখ ফেরাতে পারছি না সেই নলটি থেকে। স্থিরচোখে তাকিয়ে আছি। আর একটি মুহূর্ত, কত দীর্ঘ হয় এই মুহূর্ত? কত দীর্ঘ?

হেই খোদা, তুমি আমাকে একটু শক্তি দাও। একটুখানি শক্তি। একটুখানি সাহস, কিছু চাই না খোদা তোমার কাছে, শুধু একটু সাহস, যেন নিজের পায়ের ওপর মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। এই শুয়োরের বাচ্চাগুলো যেন না বোঝে আমি ভয় পেয়েছি। আমি অনেক ভয় পেয়েছি খোদা, কিন্তু এরা যেন না বোঝে। দেখো খোদা তুমি আমারে, দেখো প্লিজ, আমি থাকব না খোদা, কিন্তু এই দেশটা থাকবে। এই দেশটারে তুমি স্বাধীন করে দিও। হেই খোদা, দোহাই লাগে তোমার, কসম লাগে—

শেষ কথা

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ড. সুরাইয়া তার মেয়ে শারমিনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'সেকি! তুই ঘুমুসনি?'

'না আম্মু।'

'আমি না ফোন করে বললাম দেরি হবে...'

'সেই জন্যেই তো অপেক্ষা করছি।' ড. সুরাইয়ার পনেরো বছরের মেয়ে শারমিন বলল, এত রাতে একা একা ঘরে ঢুকতে তোমার ভালো লাগত? এখন আমি যে জেগে আছি তোমার ভালো লাগছে না?'

'তাই বলে—' ড. সুরাইয়া কথাটা শেষ না করে হেসে ফেললেন। মেয়েটা ঠিকই বলেছে, মেয়েটা জেগে আছে দেখে আসলেই তার ভালো লাগছে।

'আজকাল জেগে থাকা কোনো ব্যাপারই না আম্মু! টেলিভিশনে কতগুলো চ্যানেল, তুমি জানো? আমি কমপক্ষে এক ডজন মার্ডার আর আধাডজন রেপ দেখে ফেলেছি।'

'খুব কাজের কাজ করেছিস।' ড. সুরাইয়া তার ব্যাগটা টেবিলে রেখে চুলগুলো খুলতে খুলতে বললেন, 'খেয়েছিস তো, নাকি না খেয়ে বসে আছিস?'

'ইয়েস অ্যান্ড নো।'

'সেটার মানে কী?'

'ইয়েস মানে দুইটা চিপসের প্যাকেট আর আধ গ্লাস পেপসি খেয়েছি। নো মানে ডিনার খাইনি, তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

ড. সুরাইয়া অনুযোগ করে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। হঠাৎ বুঝতে পারলেন তার মেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে। তাকে আর জোর করে কিছু করানো যাবে না, সে যেটা চাইবে সেটাই করবে। শারমিন বলল, 'আম্মু, চিপস খেয়ে পেট ভরে নাই, অসম্ভব খিদে লেগেছে। তুমি এখন দশ ঘণ্টা লাগিয়ে গোসল করতে শুরু করো না—'

ড. সুরাইয়া কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'কোনো দিন আমি দশ ঘণ্টা লাগিয়ে গোসল করি?'

'আমি টেবিলে খাবার দিচ্ছি, দেরি যেন না হয় আম্মু।'

'দেরি হবে না, তুই দ্যাখ তুই টেবিলে খাবার দেওয়ার আগেই আমার হয়ে যাবে।'

শারমিন জানে আসলেই সে টেবিলে খাবার দিতে দিতে তার মা বের হয়ে আসবে, পৃথিবীর একটি বিষয়ও নেই, যেখানে তার মায়ের কোনো সীমাবদ্ধতা আছে। তার মাকে যে সে কী ভালোবাসে কেউ যদি শুধু জানত।

খাবার টেবিলে মায়ের প্লেটে ভাত তুলে দিতে দিতে বলল, 'আম্মু, বলো দেখি ভাতটা কেমন হয়েছে?'

'পারফেক্ট। দশে সাড়ে নয়।'

'পারফেক্ট হলে দশে সাড়ে নয় কেন? দশে দশ না কেন?'

'উঁহু। দশে কেউ কখনো দশ পাবে না। সবাই শুধু চেষ্টা করবে, দশে দশ পাওয়ার জন্য। কাছাকাছি পৌঁছাবে কিন্তু পাবে না।'

'তোমার সার্জারি কী রকম হলো?'

'পারফেক্ট। তোর ভাতের মতো।'

'দশে কত।'

'দশে সাড়ে নয়।'

'তোমার কত গেল।'

ড. সুরাইয়া মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিসের কত গেল?'

'এই সার্জারির পেছনে। পৃথিবীর সব সার্জন সার্জারি করে টাকা বানায়, তোমার শুধু টাকা লস হয়।'

ড. সুরাইয়া হাসলেন। বললেন, 'না, এবার আমার পকেট থেকে কিছু যায়নি। শুধু মেয়েটাকে যখন রিলিজ করা হবে তখন একটা সুন্দর ফ্রক কিনে দিতে হবে। তুই কিনতে পারবি না?'

'তুমি মানুষকে ফ্রি সার্জারি করে দিতে পারবে আর আমি একটা ফ্রক কিনতে পারব না? আমি কি এত অপদার্থ? বয়স কত মেয়েটার?'

'বারো। বয়সের তুলনায় একটু ছোট।'

'ঠিক আছে। নো প্রবলেম।'

দুজনে নিঃশব্দে খেতে থাকে। শারমিন হঠাৎ তার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আম্মু, তুমি এ রকম কেন?'

ড. সুরাইয়া অবাক হয়ে বলল, 'কী রকম?'

'ডিফারেন্ট। আমাদের পরিচিত এত মানুষ, সবাই একেবারে অর্ডিনারি। কেউ বড়লোক, কেউ বড় অফিসার, কেউ ফেমাস। কিন্তু সবাই এত অর্ডিনারি যে দেখলে হাই উঠতে থাকে। তুমি একেবারে অন্য রকম। আই অ্যাম সো প্রাউড অব ইউ—'

ড. সুরাইয়া বাচ্চা মেয়ের মতো খিলখিল করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'নাকে ফুটো করবি? তার পারমিশন দরকার?'

'সেটা তো করবই। তুমি পারমিশন না দিলেও করব। কিন্তু আমি সিরিয়াস। তুমি কি ছোট থেকে এ রকম?'

'কী রকম?'

'এই যে অন্যের জন্য জান দিয়ে দাও।'

'আমি কি জানি...'

'বলো না আম্মু, প্লিজ। ছোট থাকতে কি আমাদের মতো ছিলে, নাকি ছোট থেকেই মাদার তেরেসা?'

ড. সুরাইয়া একটু বিপন্নভাবে তার মেয়ের দিকে তাকালেন। তার মেয়েটি যে প্রশ্ন করেছে, তার কি উত্তর দেওয়া সম্ভব? শারমিন হাল ছাড়ল না, 'তোমার কি জীবনে কোনো ঘটনা ঘটেছে, যার জন্য এ রকম হয়েছ? কোনো মানুষের ইনফ্লুয়েন্স। কোনো পীর। কোনো মহান ব্যক্তি? কোনো ব্যর্থ প্রেম—'

ড. সুরাইয়া হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে গেলেন। শারমিন চোখ বড় বড় করে বলল, 'আছে। তাই না আম্মু? কোনো ঘটনা আছে।'

'না নেই।'

'নেই?' শারমিনের খুব আশাভঙ্গ হলো।

'তবে—'

'তবে?' শারমিন আবার সোজা হয়ে বসে।

'তবে ছোটবেলার একটা ঘটনা আমি কখনো ভুলতে পারি না।'

'কী ঘটনা আম্মু?'

ড. সুরাইয়া হঠাৎ কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে গেলেন। নরম গলায় বললেন, 'সেভেন্টি ওয়ানে আমরা ঢাকা থেকে পালিয়ে গ্রামে গিয়েছি। আমার বাবা

গ্রামে একটা পাকা বাড়ি শুরু করেছেন। সেটা শেষ হয়নি। সেখানেই থাকি। তার মধ্যে খবর পেলাম আমরা যে গ্রামে এসেছি সেখানে মিলিটারি ক্যাম্প করেছে। আমার বয়স তখন তেরো-চৌদ্দ। বাড়ি থেকে বের হওয়া নিষেধ। চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ির ভেতরে থাকি।

'তার মধ্যে একদিন খুব সকালে কে যেন বলল রাজাকাররা একটা মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাসা রাস্তার পাশে, এই রাস্তা দিয়েই নেবে। আমি তখন জানালায় দাঁড়িয়ে আছি মুক্তিযোদ্ধাকে দেখার জন্য।

'হঠাৎ দেখি আট-দশটা রাজাকার আসছে আর ঠিক তার মাঝখানে একটা ছেলে। তুই বিশ্বাস করবি না, আমার বয়সী একটা ছেলে, হাতটা পেছনে বেঁধে রেখেছে গামছা দিয়ে, কপালের কাছে কেটে গেছে, সেখানে একটু রক্ত জমাট বেঁধে আছে, ছেলেটা পা টেনে টেনে হাঁটছে, আমি একেবারে নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে আছি, হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ছেলেটি আমার দিকে তাকাল, আর তুই বিশ্বাস করবি না, আমার বুকটা কেঁপে উঠল। মানুষের চোখ আর সেই চোখের দৃষ্টি যে কী সাংঘাতিক একটা জিনিস কেউ জানে না, ছেলেটা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, আমিও তার দিকে তাকিয়ে আছি, চোখ সরাতে পারছি না, আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, দেখছি, কী বীরের মতো সে হেঁটে যাচ্ছে! সাধারণ চেহারার একটা ছেলে অথচ আমার মনে হলো কী অসাধারণ হ্যান্ডসাম! হাত দুটো পেছনে নিয়ে কনুইয়ের কাছে বেঁধে রেখেছে, শরীরের কাপড় ছেঁড়া, কাদা আর রক্ত দিয়ে মাখামাখি, কপালের কাছে কাটা, সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে আছে অথচ তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে বুঝি আকাশের সমান উঁচু, তার পাশে রাইফেল হাতে রাজাকারগুলো দুর্বল ভীতু, মনে হচ্ছে যেন জন্তু-জানোয়ার, মনে হচ্ছে পোকা-মাকড়।

'ছেলেটা হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম আমি আর কোনো দিন তাকে দেখতে পাব না। আমার ছেলেমানুষ বুকটা তখন কেমন জানি হাহাকার করে উঠল, ইচ্ছে করল ছুটে গিয়ে তার মাথাটা বুকে চেপে ধরে রাখি। কিন্তু সেটি তো আর করতে পারব না, তাই হাত নাড়লাম তার দিকে তাকিয়ে। ছেলেটার হাত বাঁধা। সে তো আর হাত নাড়তে পারবে না, তাই সে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। সেই হাসিটা যে কী অদ্ভুত একটা হাসি, তুই কোনো দিন চিন্তাও করতে পারবি না।

'তখন আমি ছোট, বয়স কম, মাত্র টিনএজ হয়েছি। আমি জানালার শিক ধরে ছেলেটার জন্য কাঁদতে লাগলাম।'

শারমিন অবাক হয়ে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখে মনে হতে লাগল এত দিন পর আবার বুঝি তার মা কেঁদে দেবে। কিন্তু ড. সুরাইয়া কাঁদলেন না, একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দুই ঘণ্টা পরে খবর পেয়েছি ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে।'

শারমিন বুক থেকে আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের করে দিল। ড. সুরাইয়া কিছুক্ষণ তার খাবার প্লেটের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এত দিন হয়ে গেছে, আমি এখনো সেই ছেলেটার চাহনিটা ভুলতে পারি না। শুধু মনে হয়—'

ড. সুরাইয়া কথা শেষ না করে চুপ করে গেলেন। শারমিন হাত দিয়ে তার মায়ের হাত ধরে বলল, 'কী মনে হয় আম্মু?'

'মনে হয় এই ছেলেটা যে দেশটাকে দেখে যেতে পারল না, তার জন্য যদি কিছু একটা করতে পারতাম! বেশি দরকার নেই, এই এতটুকু—'

'করেছ আম্মু। তুমি অনেক করেছ।'

ড. সুরাইয়া কিছু বললেন না। তাকে হঠাৎ কেমন যেন আনমনা দেখায়। তিনি তার প্লেটে ভাতগুলো হাত দিয়ে নাড়তে লাগলেন।

দশে সাড়ে নয় পাওয়া ভাত।

১৫ অক্টোবর ২০০৩